দেবারিগণ

অবধূত

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ

-সাড়ে চার টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে বাসন্তী দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক নিউসরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

পরম শ্রদ্ধেয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

বুধবার

১৪ই পৌষ, ১৩৬৬

৩০-১২-৫৯

দেবারিগণ

আজ নয়, কাল নয়,—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে এ কাহিনী হয়তো লুকিয়ে আছে। আশায় মানুষ বেঁচে আছে; আশা করতে দোষ কি যে, এমন একটা সময় আসছে যখন ঘুষ ভেজাল ধরাধরি—এই তিন শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব। তখনকার সেই অভিশাপমুক্ত জাতির কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।

—লেখক

এ দুনিয়ায় কত জাতের বাতিক-ই না আছে!

শান্তনু রুদ্রের ব্যাপারটাকেও এক জাতের বাতিক বলা চলে। ফাঁড়াটা কখনও অল্পস্বল্পের ওপর দিয়ে কেটে যায়, আবার কখনও সাংঘাতিক ধরনের হয়ে ওঠে। এমনিতে বেশ ভালমানুষটি, খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন লেখাপড়ায় ডুবে আছেন। আলাপ-আলোচনা হাসি-ঠাট্টায় যখন মেতে থাকেন, তখন কার সাধ্য ধারণা করবে কোনও অসুখ-বিসুখ আছে ওঁর। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ভাবটা বদলাতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলেন। দু-একটা দিন কাটল সেই ভাবে, তার পর শুরু হল খোঁজাখুঁজি। দিনের বেলা নিজের ঘরের সব-কটি দরজা জানলা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন। বাক্স পেঁটরা দেরাজ আলমারি খুলে সেগুলোর জঠরের যাবতীয় সামগ্রী ঘরময় ছড়ালেন। সমস্ত জামা-কাপড়ের পাট খুলে ঝেড়েঝুড়ে দেখলেন। খাটের উপর থেকে তোশক গদি নামিয়ে ফেললেন। দেওয়ালের গা থেকে ছবিগুলো খসালেন। ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করে ফেললেন সব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল, দরজা খুলল না। গোটা দুটো রাত দুটো দিনই হয়তো কেটে গেল সেই ভাবে। তার পর খুলল দরজা, লণ্ডভণ্ড ছত্রাকার জিনিসগুলোর কবল থেকে মুক্তি পেলেন শান্তনু রুদ্র। বাতিকের ঘোর তখনও কাটে নি কিন্তু। ঘর থেকে বেরিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা একেবারে রাস্তায় নামলেন। এক বস্ত্রে, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি অবস্থাতেই বেরোলেন বাড়ি থেকে। শুধু ফতুয়াটাই হয়তো গায়ে আছে, হয়তো তাও নেই। কাপড়ের খুঁটটাই শুধু রয়েছে গলায় জড়ানো। আর থাকবার মধ্যে আছে পুরু চশমাটা চোখের সামনে আঁটা। মাথা নীচু করে রাস্তার ওপর নজর রেখে চলতে লাগলেন। কি যেন

হারিয়েছেন, সেটা হয়তো এখনও পড়ে আছে পথে। খুঁজতে খুঁজতে পেলেও পেয়ে যেতে পারেন জিনিসটা।

বাতিক আর কাকে বলে!

অনেক সময় ভালয় ভালয় কেটে যেত ঝোঁকটা। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে বাড়ি ফিরতেন শান্তনু রুদ্র। স্নান-আহার করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন কয়েক ঘণ্টা। ঘুম থেকে উঠলে আর কোনও গোলমাল থাকত না। তখন সেই হাসিখুশিতে মশগুল সদানন্দ মানুষটিকে দেখে কার সাধ্য বুঝবে যে, বাতিকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কি রকম সব উদ্ভট কাণ্ড করতে পারেন উনি। বোঝার উপায় ছিল না বলেই অনেক সময় বাতিকের শেষটুকু চরমে গিয়ে পেঁৗছত। প্রায় সেটা ঘটত রাস্তায় দশ জনের চোখের সামনে। বাড়িতে এতটুকু অশান্তি হত না। কারণ একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না শান্তনু রুদ্রের বাড়িতে। স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী সহ্য করে করে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই তিনি বাধা দিতেন না, বাধা দিতে গেলে কত দূর অনর্থ ঘটতে পারে তা তিনি হাড়ে হাড়ে জানতেন। কিন্তু রাস্তার মানুষ, যাঁরা মোটেই চিনতেন না শান্তনু রুদ্রকে, তাঁদের মধ্যে কারও হয়তো কৌতূহল জাগল। একমনে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক কিছু খুঁজছেন পথের ওপর, এ দৃশ্য দেখলে লোকের কৌতূহল হয়ই। শুধু কৌতূহল কেন, অনেকের মনে একটু সহানুভূতির উদ্রেক হওয়াও স্বাভাবিক। আহা রে, না জানি কি বহুমূল্য জিনিস হারিয়েছেন বুড়ো ভদ্রলোকটি!

শান্তনু রুদ্রকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা ওঁর দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজে চলে যেতেন। তাঁরা জানতেন, ও সময় ওঁকে ঘাঁটাতে যাওয়ার ঝুঁকিটা কতখানি। যাঁরা চিনতেন না ওঁকে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাধিয়ে বসতেন প্রমাদ। নিজেও পড়ে যেতেন ঘোর বিপাকে। সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে পরের ব্যাপারে নাক গলাবার ফল হাতে হাতে লাভ করতেন।

"কি খুঁজছেন মশাই? হারাল নাকি কিছু?"

খুবই সরল প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তার সুরে অকপট কৌতূহল আর একটু দরদ। কিন্তু সেই দরদী সরল প্রশ্নের জবাবটি বাঁকা পথ ধরল তৎক্ষণাৎ। প্রথমেই বেঁকতে শুরু হল ঘাড়, মাথাটা সোজা হল না, মুখটাও উঠল না। তেরছা চোখের কোণ দিয়ে প্রশ্নকর্তার মুখ পানে তাকালেন রুদ্রমশাই। সেই বিষাক্ত চাউনির অর্থ বুঝতে পেরে অপর পক্ষের কৌতূহল ঠাণ্ডা হল তো ভালই, নয় তো ঘটল অঘটন। কয়েক মুহূর্ত সেই ভাবে তাকিয়ে থাকার পরে চিবিয়ে চিবিয়ে উল্‌টো প্রশ্ন করলেন রুদ্রমশাই:

"যা-ই খুঁজি না কেন, তাতে আপনার কি?"

তখনও যদি প্রশ্নকর্তা মানে মানে সরে পড়েন রুদ্রমশায়ের চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে, তা হলে ঝক্কিটা অল্পের ওপর দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু তা তো আর হয় না, অনেকেই হকচকিয়ে যায়। সহজ কথার অমন বাঁকা জবাব শুনে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন ঘটে বিপত্তি। ক্রমেই চড়তে শুরু করে রুদ্র মশায়ের স্বর, চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। ষাট বছরের পুরনো মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। একটু একটু করে এগিয়ে যান রুদ্রমশাই প্রশ্নকর্তার দিকে, মুখখানা প্রায় ঠেকিয়ে ফেলেন সে-বেচারার মুখের সঙ্গে। তার পর এক নিঃশ্বাসে এক রাশ প্রশ্ন করে বসেন:

"আপনার কি? যা খুশি আমার খুঁজছি, আপনাকে কৈফিয়ত দেব কেন? আপনি বাধা দেবার কে? পরের ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন যে বড়?"

বলতে বলতে দু পায়ের আঙ্গুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে অনেকটা উঁচু হয়ে ওঠেন রুদ্রমশাই, দু হাতের মুঠো কষকষে করে বাগিয়ে ধরেন। তখন আর বাঙলাতে কুলোয় না, বাঙলা হিন্দী ইংরেজী উর্দু এক সঙ্গে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বেরোতে থাকে তাঁর মুখ থেকে:

"হু আর ইউ নবাব তেজচন্দ্র? নচ্ছার ভ্যাগাবণ্ড পাজী জোচ্চোর বেইমান বেয়াদব—হু দি হেল্ ইউ আর?"

বুকের দমে যতক্ষণ কুলোয়, যা মুখে আসে তাই আওড়াতে থাকেন রুদ্রমশাই। যাকে বলে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত, তা-ই ঘটে।

এইটুকুই হল শান্তনু রুদ্রের বাতিক।

রক্ষে এই, সব সময় বাতিকটা ওঁর স্কন্ধে ভর করে থাকে না। ন'মাস-ছ'মাসে হঠাৎ এক দিন চাড়া দিয়ে ওঠে। দু-চার-দশ দিন এক রকম বেহুঁশ অবস্থায় কাটে, আহার-নিদ্রা ভুলে যান। চেনা মানুষকেও চিনতে পারেন না, খালি খোঁজেন—প্রথম নিজের ঘরখানা, তার পর সারা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খোঁজেন। শেষে নামেন রাস্তায়। কাছাকাছি মাঠ ঘাট বাজার হাট সর্বত্র খুঁজে বেড়ান। কি যে খোঁজেন, কেউ জানে না। কেলেঙ্কারির ভয়ে জানবার প্রবৃত্তিও নেই কারও। রুদ্রমশায়ের চেনা-জানা যাঁরা, তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওঁর আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঁর দুর্ভাগ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন সকলে।

"আহা রে—অত বড় মানুষটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল! এ সময় ছেলেটাও যদি কাছে থাকত!"

ঐ আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কি করতে পারে মানুষ। তার পর সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। কে জানে, কবে আবার হঠাৎ রুদ্রমশায়ের বাতিকটা চাড়া দিয়ে ওঠে! খেয়াল তো।

বাতিকের আক্রমণ বাতিকের খেয়াল মত হলেও রুদ্রমশাই কিন্তু দিনে দিনে হালকা হয়ে যেতে লাগলেন মানুষের কাছে। দু-দশ বার রাস্তার ওপর রুদ্র-রসাত্মক বাচালতা করার ফলে সুড়-সুড়ি লেগে গেল লোকের মনে। সম্ভ্রমবোধ সহানুভূতি চক্ষুলজ্জা, এই সমস্তর খাতিরে প্রথম দিকে সবাই সহ্য করে ছিল বাতিকের

বাচালতা। তার পর একের বাতিক দশের মগজে সংক্রামিত হল। মজা দেখার, মজা দেখে মজবার শখটি বোধ হয় মনুষ্য নামক জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রকোপে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায়। রুদ্রমশায়ের পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে অনেককে মজা দেখার বাতিকে পেয়ে বসল। আড়াল থেকে তাঁরা ছেলে-পিলেদের উস্‌কে দিলেন। দূরে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন শান্তনু রুদ্রকে।

"ঐ যে ঐ আসছেন—কি-হারিয়েছেন-বুড়ো।"

কি-হারিয়েছেন-বুড়ো—নতুন উপাধি হল রুদ্রমহাশয়ের। উপাধি উপব্যাধির মত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে তার লক্ষণগুলো। শান্তনু রুদ্রের নতুন উপাধিটিও নিজগুণে নিজের মহিমা ছড়াতে লাগল। কচি কাঁচা ডাঁসা মনগুলোতে মৌতাত জমে গেল। সজ্ঞানে সুস্থচিত্তে রাস্তায় বেরিয়েও চারিদিক থেকে কচি-কাঁচা গলার উল্লাসধ্বনি শুনতে লাগলেন রুদ্রমশাই।

"ও—কি-হারিয়েছেন-বুড়ো। ও বুড়ো—কি হারিয়েছে তোমার?

এই নতুন ডাকটি যে তাঁকেই দেওয়া হচ্ছে—বুঝতে পেরে রুদ্র মশাই খুবই আমোদ পেলেন। যারা ডাক দিচ্ছে তাদের কাউকে নাগালের মধ্যে পেলে জড়িয়ে ধরে আদরও করলেন। কার ছেলে বা কার মেয়ে, কেমন পড়াশুনা হচ্ছে, ইত্যাদি সংবাদ নিলেন সন্তুষ্ট চিত্তে। ফলে আরও আশকারা পেয়ে গেল সকলে। 'কি-হারিয়েছেন-বুড়ো' নামটি কায়েমী ভাবে শিকড় গাড়ল সকলের মগজে। তার পর এক দিন যা ঘটার তা ঘটে বসল।

সেদিনও বেরিয়েছিলেন রুদ্রমশাই তাঁর হারানো ধন খুঁজতে। দু পাশ থেকে কচি কণ্ঠের চিৎকার উঠল:

"ও বুড়ো, ও কি-হারিয়েছেন-বুড়ো।"

সেদিন আর রুদ্রমশাই সাড়া দিলেন না, গোঁ ভরে মাথা

নীচু করে পথের ওপর নজর রেখে এগিয়ে চললেন। তাতে কচি-কাঁচাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেল, দল বেঁধে পেছু নিলে তারা। সমস্বরে চিৎকার উঠল—"ও বুড়ো, ও কি-হারিয়েছেন-বুড়ো, ও বুড়ো তোমার হারিয়েছে কি ?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই, বিকট ভঙ্গিমা করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নৃত্য জুড়ে দিলেন, তাড়া করে গেলেন ছেলেমেয়েদের। অর্থাৎ বদ্ধ পাগলের যা যা করা উচিত সবই করে বসলেন।

প্রথমটায় ভড়কে গেল সকলে, দূরে সরে দাঁড়াল। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে যেটুকু দেরি, তার পর আর পায় কে তাদের! মজাটা দশগুণ বেড়ে গেল দেখে রুদ্রমশাইকে ঘিরে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল। আকাশ-বাতাস চিরে মহারব উঠল।

"কি-হারিয়েছেন-বুড়ো! ও বুড়ো মশাই, ও কি-হারিয়েছেন-বুড়ো মশাই।"

এক সময় দম ফুরিয়ে গেল, বাতিকটা ছুটে গেল। হুঁশ ফিরে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন রুদ্রমশাই। লজ্জায় ঘেন্নায় ভয়ে পথের ধুলোয় মিশে গেলেন একেবারে। দু হাতে নিজের মুখখানা ঢেকে পথের ওপর বসে পড়লেন। ছোটদের দম অফুরন্ত, তারা দেখল মজাটা আরও জমে উঠছে। ইতিমধ্যে ছোটদের পেছনে বড়রাও জুটে গেছেন। ছেলেপিলেদের থামানো দূরে থাক, টীকা-টিপ্পনীর আহুতি প্রদান করে উৎসাহের আগুনটা আরও জাঁকিয়ে তুললেন তাঁরা। সেই অগ্নিকুণ্ডের মাঝে অসহায়ভাবে বসে রইলেন রুদ্রমশাই মুখ কান দু হাতে চাপা দিয়ে, সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সেই অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হত, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কত দূর গড়াত, কে বলতে পারে। কিছুক্ষণ পরে রুদ্রমশাই বুঝতে পারলেন, কে যেন জাপটে ধরলে পেছন থেকে। দুখানা হাত ঢুকল তাঁর দুই বগলের ভেতর। ওপর দিকে টানের চোটে তিনি

খাড়া হতে বাধ্য হলেন। তার পর পেছনের ঠেলায় এগিয়ে চললেন সামনে। একান্ত বিনীত কণ্ঠের অনুরোধ শুনতে পেলেন পেছন থেকে :

"আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

বক্তা তাঁর ডান পাশে এসে তাঁর হাতখানা নিজের কাঁধে তুলে নিলে, নিজের বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে তাঁর কোমরটা শক্ত করে। ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্রমশাই তার মুখখানা ভালভাবে দেখতে পেলেন না। দেখলেন শুধু একটা মাথা, কোঁকড়ানো চুল সুদ্ধ মাথাটা তাঁর কাঁধের অনেক নীচে পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর কিছু দেখার সুযোগই হল না তখন, তাড়াতাড়ি পা চালাতে হল। অচেনা তুখানি হাতের বাঁধনে বাঁধা পড়ে রুদ্রমশাই সেদিন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন।

হারানো ধন খুঁজে পেলেন রুদ্রমশাই।

পথেই পেলেন, পথ খোঁজা সার্থক হল তাঁর। বাড়িতে পৌঁছে শুধু তুটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন তাকে :

"কি নাম তোমার বাবা? বাড়ি কোথায়?"

নামটি জানতে পারলেন। কল্যাণ গুপ্ত তার নাম। বাড়ির ঠিকানা জানতে পারলেন না। ঠিকানা নেই, যখন যেখানে থাকে, তখন সেইটাই তার ঠিকানা জেনে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন :

"বাঁচলাম বাবা, তা হলে আজ থেকে এই ঠিকানাই হল তোমার। এই হতভাগা বুড়োটাকে ফেলে আবার পালিও না যেন। একেবারে সব শেষ হয়ে গেলে এই হাড়-মাংসের বোঝাটা চিতায় তুলে দিয়ে তবে তোমার ছুটি। কেমন!"

মুখ-ঢাকা শ্বেত পাথরের গেলাস হাতে নিয়ে, সগুস্নান-করা ভিজে চুলগুলো দিয়ে যত দূর সম্ভব নিজের মুখখানা আড়াল করে ঘরে ঢুকলেন ইন্দুমতী দেবী। সবই তিনি জানতে পেরেছেন। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সবই বলেছে তাঁকে কল্যাণ। কি অবস্থায় কোথায় সে পায় রুদ্রমশাইকে, কেমন ভাবে তাঁকে তুলে নিয়ে আসে, বাড়িতে পৌঁছে রুদ্রমশাই কি তাকে বলেন, সমস্তই জেনে নেন ইন্দুমতী দেবী। কত বড় বিপদটা ঘটতে পারত, ভাবতে গিয়ে তাঁর মাথা ঘুরে যায়। তৎক্ষণাৎ ছেলেটির দু হাত ধরে তিনিও কথা আদায় করেন, কখনও সে তাঁদের ফেলে কোথাও যাবে না:

"আমার পেটের ছেলে থেকেও নেই বাবা। তুমিই আমার সন্তান। কথা দাও আমায়, এই হতভাগী মাকে ফেলে কোথাও পালাবে না।"

তাঁকেও কথা দিয়েছিল কল্যাণ। কথা দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত করে এক গেলাস শরবত নিয়ে রুদ্রমশায়ের কাছে যেতে বলেছিল। নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে রুদ্রমশায়ের, যে ধকলটা সহ্য করতে হয়েছে তাতে হয়তো শুকিয়ে গেছে বুক। শরবতের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ইন্দুমতী দেবী। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। পাছে চোখে চোখ মেলে, এই ভয়ে নিজের মুখখানা ওধারে ফিরিয়ে রইলেন। গেলাসটা শুধু বাড়িয়ে ধরলেন।

রুদ্রমশায়েরও তখন মুখ লুকোবার মত অবস্থা। পিঠখাড়া চেয়ারখানা জানলার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে জানলার বাইরে নজর ফেলে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন পাথরের মূর্তির মত। কি যে দেখছেন তা হয়তো নিজেও জানেন না। বাইরের চোখ-জ্বালা-করা রোদের দিকে তাকিয়ে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎটাকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। হয়তো হঠাৎ দেখতে

পেয়েছিলেন নিজের অতীতটাকেই। এক সময় তিনি খুব ভাল করে চিনতেন অতি বিখ্যাত এক শান্তনু রুদ্রকে। খুবই নাম-করা লেখক ছিল লোকটা, ভয়ানক নামজাদা কয়েকখানা বই লিখে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিল দেশে। যত নিন্দা তত স্তুতি অঝোরে ঝরে পড়ত তখন সেই শান্তনু রুদ্রের শিরে। বড় বড় সভার সভাপতি করে নিয়ে যাওয়া হত সেই লেখককে। দেশসুদ্ধ মানুষ কৃতকৃতার্থ হয়ে যেত তখন শান্তনু রুদ্রের একটি বাণী পেলে। কি না ছিল তখন তাঁর! ঘর ছিল, ঘরণী ছিল, এক ছেলে ছিল। ছেলেটিকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়ে খুবই নাম-করা মানুষ তৈরী করেছিলেন শান্তনু রুদ্র। কিন্তু সে ছেলে তাঁর হঠাৎ এক দিন হারিয়ে গেল।...আরও কত কি হারিয়ে গেল। সর্বহারা হয়ে যে লোকটা আজ শান্তনু রুদ্রের নামের খোলস পরে বেঁচে রয়েছে, তার সঙ্গে সেই আসল শান্তনুর কোথাও কিছু মিল আছে কি না, তাই বোধ হয় মিলিয়ে দেখছিলেন রুদ্রমশাই।

আচম্বিতে রুদ্রমশায়ের মনে হল, চেয়ারখানা যেন সাঁ-সাঁ করে তলিয়ে যাচ্ছে তাঁকে নিয়ে। সভয়ে তিনি দু হাতে খামচে ধরলেন চেয়ারের দু পাশের হাত রাখার হাতল দুটোকে। সেই সময় অতি সামান্য একটি শব্দ কানে ঢুকল তাঁর। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শব্দটি আচমকা জন্মগ্রহণ করল—"ধর"। শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি। তার পর অনেক চেষ্টা করে মুখ ফেরালেন এধারে, চোখ কিন্তু তুললেন না। হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

গেলাসের মুখের ঢাকাটা তুলে নিলেন ইন্দুমতী, নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। চুপ, দু জনের কারও মুখে রা নেই। ধ্বনিহীন ভাষার নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি ঘুরপাক খেতে লাগল ঘরের মধ্যে। সেই প্রতিধ্বনির

অর্থটুকু ধরবার জন্যেই বোধ হয় দু জনে দু দিকে মুখ করে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন রুদ্র মশাই :

"এবার আমি লিখব গভর্নমেণ্টকে, হয় ওরা আমাকে আমার ছেলের ঠিকানা জানাক, নয়তো তাকে চাকরি থেকে রেহাই দিক। চাই না আমি টাকা। ও ভাবে আমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখবার কারও কোনও অধিকার নেই। ও রকম টাকায় দরকার নেই আমার।...ছেলে চাই আমার, ছেলের কাছে আমি থাকব!"

চমকে উঠলেন ইন্দুমতী। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন স্বামীর পানে। আতঙ্কে ঘোলাটে হয়ে উঠল তাঁর চোখ দুটি। অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ ধরে শক্ত করে ফেললেন নিজেকে। তার পর সজোরে মাথা নাড়িয়ে তীব্র স্বরে বলে উঠলেন :

"না।"

বলেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। দুই চোখ টিপে বন্ধ করে দম আটকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ও সম্বন্ধে আর একটি কথাও না শুনতে হয় তাঁকে—এই জন্যই বোধ হয় ও রকম করে রইলেন।

পাশের টুলের ওপর শরবতের গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন রুদ্রমশাই। তার পর চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজাসুজি স্ত্রীর দিকে মুখ করে বসলেন। নিছক অপরাধীর চাউনি ফুটে উঠল তাঁর চোখে। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন :

"ভুল করেছিলাম। ভয়ানক অন্যায় করেছিলাম তাকে যেতে দিয়ে। তুমি বাধা দিয়েছিলে, ছেড়ে দিতে চাও নি তোমার ছেলেকে। শুনি নি আমি। ওইটুকু বয়সে মস্তবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ পাচ্ছে, স্বয়ং

প্রধানমন্ত্রী বাড়িতে এসে অনুরোধ জানালেন ছেড়ে দেবার জন্যে। লোভ সামলাতে পারলাম না।...বণ্ডের ওপর লিখে দিলাম, আমাদের আপত্তি নেই। তোমাকে দিয়েও জোর করে লেখালাম। ভয়ানক ব্যাদড়া ছেলে তোমার ইন্দু, ঝোঁক উঠলে কিছুতেই ফিরবে না। আমাদের সম্মতি সে আদায় করতই! ভালয় ভালয় মত দিয়েছিলাম তাই রক্ষে, নয়তো না খেয়ে শুকিয়ে মরবার ভয় দেখিয়েও সে আমাদের মত নিত। ছোটবেলা থেকেই তাই করেছে, যখন যা গোঁ ধরেছে তখনই তাই আদায় করেছে। কিন্তু এবার সে মোক্ষম ঠকান্ ঠকিয়ে গেল। আপত্তি নেই বলে সই করলাম যখন, তখন কি ছাই জানি যে এ চাকরি করতে হলে মা-বাপকে পর্যন্ত নিজের ঠিকানা জানাতে পারবে না। এই বিশ্রী ব্যবস্থা জানতে পারলে আমি তাকে কিছুতেই এ চাকরি করতে দিতাম না। যা করে খাচ্ছিল, তাই করত।...কেন, অধ্যাপকের কাজ খারাপ কিসের? সকলে সম্মান করে, পরে অধ্যক্ষও হতে পারত নাম-করা কোনও কলেজের।...না না, আর কিছুই শুনব না। গভর্নমেণ্টকে লিখব, তাতে যদি গভর্নমেণ্ট রাজী না হয়, মকদ্দমা করব। আমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখার কোনও অধিকার নেই কারও। ও রকম টাকায় দরকার নেই আমার। ছেলের হাতে এখন নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। সে ছাড়া কে আমায় বাঁচাবে এখন? এই কেলেঙ্কারির হাত থেকে কে আমায় রক্ষা করবে?”

শুনলেন ইন্দুমতী সবটুকু। শুনলেন আর প্রাণপণে নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠোঁট দুখানি কাঁপতে লাগল। শেষে অনেকটা সহজ স্বরে বলতে পারলেন:

“না, ওসব কিছুই করতে পাবে না তুমি। সে আমাদের কেউ নয়। শত্রু পেটে ধরেছিলাম আমি। তার ফল ভুগছি, ভুগবও চিরকাল। ছেলে নয় আগুন, জ্বলন্ত আগুন। কিছুতেই তোমায় আমি যেতে দেব না সেই আগুনের কাছে, কিছুতেই নয়।”

চড়ল একটু গলা, একটু যেন অসহিষ্ণুতার আভাস ফুটে উঠল তাঁর বলার ধরনে। ইন্দুমতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রুদ্রমশাই :

"অবুঝের মত কথা বলো না ইন্দু। তপু আমায় বাঁচাতে হয় বাঁচাবে, নয়তো শেষ করে দেবে একেবারে। এ-ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাব যে। যে ভাবে হোক, তপুই আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে—"

চীৎকার করে উঠলেন ইন্দুমতী :

"না না না, কিছুতেই সে বাঁচাতে পারবে না তোমাকে। তার বদলে সে নিজেই শেষ হয়ে যাবে। বার বার গভর্নমেণ্ট জানিয়েছে, কোথায় সে আছে তা জানাজানি হয়ে পড়লে শত্রুরা তাকে শেষ করে ফেলবে। বাপ হয়ে ছেলেকে যমের গ্রাসে পাঠাতে চাও—"

আর বলতে পারলেন না ইন্দুমতী, উত্তেজনায় আবেগে কথা আটকে গেল গলায়। বোধ হয় পড়েই যেতেন হুমড়ি খেয়ে, সামনের টেবিলটার উপর দু হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

আস্তে আস্তে দেহটা খাড়া করে তুললেন রুদ্রমশাই, পেছন ফিরে এগিয়ে যেতে লাগলেন জানলার দিকে। জানলার কাছে পৌঁছে দু হাতে দু গাছা শিক আঁকড়ে ধরলেন। অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় নিজেকে নিজে বোঝাতে লাগলেন :

"পাবই, নিশ্চয়ই খুঁজে পাব। একটি বার যদি হাতে পাই সে জিনিস তখন দেখে নেব কি করে তারা আমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখে আমার কাছ থেকে। কোথায় আছে, কি করছে, সব জানতে পারব তখন।…কিন্তু কোথায় যে রাখলাম জিনিসটা! নিজেই রেখেছি, খুব ভাল জায়গায় সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি, এটুকু বেশ খেয়াল আছে।…না পড়ে গেল কোথাও! কেন যে মরতে সদা-সর্বক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম!…না, নিশ্চয়ই সে জিনিস বাড়িতে

নেই। পড়েই গেছে কোথাও। নিশ্চয়ই এখনও কোথাও পড়ে আছে। হয়তো এখনও খুঁজে পেলে—"

যতক্ষণ বিড়বিড় করে বকছিলেন রুদ্রমশাই ততক্ষণ ইন্দুমতী কান পেতে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ-চোখের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। কি যে করবেন, কি করে বাধা দেবেন স্বামীকে, কি উপায়ে রুদ্রমশায়ের ভাবনাটার মোড় ফেরাবেন, একটা কিছু করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত যখন শুনলেন, আবার রাস্তায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করবার খেয়াল উদয় হচ্ছে স্বামীর মাথায়, তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরলেন রুদ্র-মশাইকে। তাঁর পিঠে নিজের মুখখানা চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

"না না না—ওগো না। হারাও নি তুমি কিছুই। কোথাও কিছু ফেলে আস নি। দোহাই তোমার—ও কথা ভুলে যাও। নয়তো আমি—আমি এই তোমার সামনে—"

স্ত্রীর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই, দু হাত দিয়ে খামচে ধরলেন ইন্দুমতীর দুই কাঁধ। অস্বাভাবিক এক ঝলক আলোয় তাঁর চোখ মুখ জ্বলে উঠেছে তখন। শ্বাস বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে ফিসফিস করে বললেন ঃ

"হারাই নি!...এ্যাঁ! হারাই নি, তা হলে খুঁজে পাচ্ছি না কেন? কোথায় রেখেছি, দাও না খুঁজে।...একটু কষ্ট করে খুঁজে দাও না লক্ষ্মীটি।"

অকপট আকুতির মূর্ছনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল ঘরের ভেতরটা। ইন্দুমতী দেবীর মাথা নুয়ে পড়ল, মুখ তুলে তাকাতেই পারলেন না তিনি স্বামীর মুখের দিকে। এক রকম অচৈতন্য অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পার হয়ে গেল অনেকটা সময়, সেই ভাবে ইন্দুমতীর দুই কাঁধ খামচে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন রুদ্রমশাই। তার পর হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়লেন, প্রচণ্ড একটা হুংকার ছেড়ে প্রাণপণে ঝাঁকাতে লাগলেন ইন্দুমতীকে :

"পেয়েছি, পেয়েছি। বল শিগ্‌গির, বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। বল বল বল—"

সেই প্রচণ্ড ঝাঁকানির মধ্যে এক বার মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন ইন্দুমতী। হাত দুখানা তুলে স্বামীর দু হাত ধরে সামান্যক্ষণ একটু টানাটানি করলেন। তার পর—তাঁর দেহটা ভেঙে পড়ল রুদ্রমশায়ের পায়ের ওপর। রুদ্রমশায়ের দু হাত খালি হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি খামচে ধরলেন নিজের মাথার দু ধারের চুলগুলো। ধরে ভীষণ জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন। মুখে সেই এক কথা :

"বল-বল-বল শিগ্‌গির, কোথায় লুকিয়েছ সে জিনিস। বল-বল-বল—"

টানের চোটে হয়তো ছিঁড়েই যেত মাথার চুলগুলো, হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন রুদ্রমশাই। আস্তে আস্তে কেমন যেন চুপ্‌সে যেতে লাগলেন। সব উত্তাপ সমস্ত বাষ্প নিঃশেষ হয়ে বেরিয়ে গেল তাঁর ভেতর থেকে। মুঠো আলগা হয়ে হাত দুখানা মাথার দু পাশ থেকে খসে পড়ল। দু কাঁধ দু দিকে অনেকটা নুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি জানলার দিকে। কি যেন শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন একান্ত মনে। কপালটা কুঁচকে উঠল, চোখ দুটো অনেক ছোট হয়ে গেল, নাকের গর্ত দুটো বড় হয়ে উঠল। সজোরে ওঠানামা করতে লাগল বুকটা। হঠাৎ কেমন যেন মুমূর্ষুপ্রায় হয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই, মহা আতঙ্কে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসার মত হয়ে উঠল। ভয়ানক চাপা সুরে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি :

"শুনছ ? শুনতে পাচ্ছ ইন্দু ? ঐ ঐ, ঐ আবার তারা আসছে। বাড়িতে আসছে এবার। এবার আমায় শেষ করে দেবে। ওঃ!"

কোনও রকমে দেহটাকে খাড়া করলেন ইন্দুমতী, টলতে টলতে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। লাভ হল না কিছুই, স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল শোরগোলটা। উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছে বহু মানুষ। ক্রমেই এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে।

অস্থির হয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই। কি করবেন, কোন্ দিক দিয়ে পালাবেন, কোথায় লুকোবেন ঠিক করতে পারলেন না। বোবা পশুর মত ছটফট করতে লাগলেন। ইন্দুমতী মুখও তুললেন না, স্বামীর পানে তাকালেনও না, স্বামীকে ধরে জোর করে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে দড়াম করে দরজা দুখানা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল কল্যাণ। পড়েই মাথার ওপর দু হাত তুলে উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিলে। মুখে এক অসংলগ্ন চিৎকার····

"হয়ে গেছে। আইন পাশ হয়ে গেছে। মার দিয়া। জয় জনমতের জয়। জয় ধর্মের জয়। ঘুষ, ভেজাল, ধরাধরি জাহান্নামে যাক। দুর্নীতি দূর হোক।"

উন্মত্তের মত নাচতেই লাগল কল্যাণ। ধাক্কা লেগে গোটা দুই টুল উল্‌টে পড়ল। রুদ্রমশাই আর ইন্দুমতী বাক্যহারা হয়ে তাকিয়ে রইলেন। উৎকট হট্টগোলটা একেবারে জানলার বাইরে এসে পৌঁছে গেল।

তখন একটা পৈশাচিক আর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল। সমস্ত হৈ-হুল্লোড় চিৎকার উল্লাস ছাপিয়ে আকাশ-বাতাস চিরে ফেললে সেই মর্মন্তুদ হাহাকার। জ্যান্ত একটা জীবকে জাঁতায় ফেলে পেশা হচ্ছে যেন। সেই ভয়ঙ্কর কাতরানি বার দু-এক শোনা গেল। তার পর আবার তলিয়ে গেল পৈশাচিক স্ফূর্তির তলায়।

ঘরের ভেতরের তিনটি প্রাণী কাঠ হয়ে গেলেন। নৃত্য থেমে গেল কল্যাণের, অদ্ভুতভাবে সে তাকিয়ে রইল বন্ধ জানলাটার দিকে। রুদ্রমশাই দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন ইন্দুমতীর হাত দুখানা, হাড়ি-কাঠে ফেলা পশুর মত অর্থহীন অবোধ্য একটা চিৎকার করে উঠলেন তিনি। শুধু নড়লেন না ইন্দুমতী, দু চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোলমাল হল্লা ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। তার পর ভারী গলা শোনা গেল জানলার বাইরে, কে যেন রাস্তা থেকে ডাকাডাকি করছে:

"রুদ্রজী, রুদ্রজী আছেন বাড়িতে?"

সাড়া দিলেন না কেউ, বোকার মত এ ওর মুখের পানে তাকালেন। আবার শোনা গেল সেই ভরাট গলার ডাক:

"রুদ্রজী, শান্তনুবাবু, রুদ্রমশাই বাড়িতে আছেন নাকি?"

জোর করে স্বামীর হাত থেকে হাত দুখানা ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ইন্দুমতী। জানলাটা একটু ফাঁক করে বললেন:

"তিনি খুবই অসুস্থ। এখন তো দেখা হবে না।"

জানলার ওধার থেকে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

"অসুস্থ! রুদ্রজীর অসুখ! কি হয়েছে তাঁর? বলুন তাঁকে, গুলাব প্রধান এসেছে। আমার নামটা তাঁকে বলুন দয়া করে। বলুন, গুলাব প্রধান দেখা না করে যাবে না।"

"কে?"

চিৎকার করে উঠলেন রুদ্রমশাই। ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। উত্তেজনায় ফেটে পড়বার মত হল তাঁর গলা:

"গুলাব! গুলাব প্রধান! প্রধানজী, তুমি! সত্যিই তুমি এলে এই অসময়ে?"

চোস্ত পাজামা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের মটকা কোট, কালো রঙের নেপালী টুপি তেরছা করে মাথায় আঁটা, দীর্ঘদেহ এক পুরুষকে

জড়িয়ে ধরে রুদ্রমশাই ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলতে লাগলেন :

"ইন্দু, এই গুলাব। এই হল আমার প্রধানজী। হাজার বার এর কথা তোমাদের শুনিয়েছি। ব্যাস—আর আমি কারও পরোয়া করি না। প্রধানজী এসে পড়েছে।"

বুকের জোরে আর কুলোল না রুদ্রমশায়ের, গুলাব প্রধানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

প্রধানজী কিন্তু এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। দু হাত জোড় করে ইন্দুমতীর দিকে ফিরে বললেন :

"হ্যাঁ, আমি এসে পড়েছি। অনেক খুঁজে খুঁজে তবে রুদ্রজীর ঠিকানা পেয়েছি। আর আপনার কোনও ভাবনা নেই ভাবীজী। আমি গুলাব প্রধান, আমি যখন এসে পড়েছি তখন রুদ্রজী এবার সেরে উঠবেন।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এক শ বার সেরে উঠব এবার। আর আমি কার পরোয়া করি, গুলাব প্রধান যখন এসে গেছে।"

খুব জোরে এইটুকু বলেই আবার রুদ্রমশায়কে থামতে হল। দমে আর কত দূর কুলোয়!

ইন্দুমতী দেবী কিন্তু কেমন যেন থ হয়ে গেলেন। একটুও আনন্দ উল্লাস উৎসাহ দেখা গেল না তাঁর চোখেমুখে। সবই যেন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, হাত ফস্‌কে বেহাত হয়ে যাচ্ছে সব। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি অচেনা মানুষটির মুখের দিকে।

কল্যাণও এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখছিল প্রধানজীর মুখখানা। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল :

"চিনেছি, চিনতে পেরেছি আপনাকে। আজ সকালেই আপনার ছবি দেখেছি খবরের কাগজে।"

প্রধানজী হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত ধরে ফেললেন। প্রশান্ত গলায় বললেন :

"দেখেছেন ? তা তো ভাল কথাই। তা অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?"

কল্যাণ কিছু বলবার আগেই রুদ্রমশাই বলে উঠলেন :

"খবরের কাগজে ছবি ছেপেছে ! কেন ? কি করেছ তুমি গুলাব ?"

কথাটাকে চাপা দেবার জন্যেই যেন চেষ্টা করলেন প্রধানজী। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন :

"না না, সে একটা তেমন কিছু নয়। এমনই পাঁচ জনের সঙ্গে ছেপে দিয়েছে। এই যেমন ভিড়ের ছবি ছাপে—"

লাফিয়ে উঠল কল্যাণ। প্রধানজীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বলে উঠল :

"ইস, তা কেন হবে। মস্ত মানুষ ইনি। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে এক জন করে জুরি আনা হয়েছে, ইনি তাঁদেরই এক জন। কম সম্মান নাকি ? সমস্ত ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, নির্ভেজাল নিরপেক্ষ, দশ জন মানুষের এক জন ইনি। দেশের শত্রুদের বিচারের ভার সর্বপ্রথম এঁরাই পেয়েছেন। একি কম সম্মানের কথা নাকি ?"

বলতে বলতে হঠাৎ ঢিপ করে এক প্রণামই করে ফেললে কল্যাণ প্রধানজীর পায়ের ওপর। ভয়ানক বিব্রত হয়ে উঠলেন প্রধানজী, এক লাফে খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়ালেন।

শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন শান্তনু রুদ্র, কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছেন প্রধানজীর মুখের দিকে। কি যেন তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। ঠাণ্ডা গলায় বেশ ভেবে-চিন্তে বলতে লাগলেন :

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। বুঝতে দাও ব্যাপারটা ভাল করে। কি একটা আইন পাশ হয়েছে বলে একটু আগে নাচছিলে না তুমি কল্যাণ ! জনগণের নাকি জয় হয়েছে তাতে ! ঘুষ, ভেজাল, ধরাধরি এবার জাহান্নমে যাবে। এই সব বলেই নাচছিলে তুমি

তখন। আর গুলাব এসেছে বিচার করতে।···কাদের বিচার গুলাব? কিসের বিচার করতে এসেছ তোমরা?”

প্রধানজী জবাব দেবার আগেই শুনতে পাওয়া গেল—

“বিচার! এর নাম বিচার! প্রথম বিচার শেষ হয়ে গেল শান্তনু।···ঐ যে শুনলে না, নরক-যন্ত্রণা দিয়ে মারবার জন্যে নিয়ে গেল দুটো লোককে? শুনতে পেলে না পৈশাচিক উল্লাস? বিচার করে জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হল অপরাধীদের। নতুন আইন তৈরী হয়েছে শান্তনু। মানুষের জন্যে মানুষে এই আইন বানিয়েছে। ওঃ ঈশ্বর—”

বলতে বলতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ তিনি, তা বোঝা যায় তাঁর সাদা দাড়ি গোঁফ আর সাদা বাবরি দেখে। চুল দাড়ি সাদা হয়েছে বটে, কিন্তু অতি সুঠাম দেহখানির কোথাও এতটুকু কোঁচ পড়ে নি। গরদের থান গরদের চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত তাঁর, পায়ে শুঁড়-তোলা চটি। বৃদ্ধের গলার স্বরে যেন সপ্ত সুর খেলা করছে। কথাগুলি বলার পর ওপর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁর ঈশ্বরের কাছেই বোধ হয় কিছু নিবেদন করতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জাতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঘরের মধ্যে।

“প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসার উত্তর প্রতিহিংসা। তার উত্তরও ঐ প্রতিহিংসা। চমৎকার ব্যবস্থা, একমাত্র প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোনও পন্থা বেরোল না মানুষের মাথা থেকে। চমৎকার—”

চমকে উঠে সবাই এক সঙ্গে তাকাল দরজার দিকে। দরজার দু ধারের কাঠ দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একখানি প্রতিমা। টকটকে লাল পাড় গরদের শাড়ি পরা, মাথার চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে, কপালে একটি চন্দনের টিপ, সেই প্রতিমা-মূর্তি যেন জ্বলছে। জ্বলন্ত প্রতিমাখানির দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না কেউ, সবাইকেই চোখ নামাতে হল। ইন্দুমতী

এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। মায়ের মত করে তিনি ডাক দিলেন ঃ

"কে—হিয়া! আয় মা আয়। অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন দরজার ওপর ?"

শান্তনু রুদ্র আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছেন তখন। মাটির দিকে তাকিয়ে একমনে কি যেন হিসেব করতে লাগলেন। মস্ত বড় একটা সমস্যায় পড়ে গেছেন যেন তিনি। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ানক চিন্তাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"কাদের বিচার করে এলে গুলাব প্রধান? বিচার করে কি রায় দিয়ে এলে তুমি ?"

অচঞ্চল কণ্ঠে প্রধানজী বললেন ঃ

"ঐ এক জন বাঙালী ডাক্তার আর এক জন রাজস্থানী বেনিয়া। ওষুধ জাল করেছিল ওরা। ভাল ভাল ওষুধ, যা দিয়ে রুগীর প্রাণ বাঁচে, তার হুবহু নকল বার করেছিল। সেই বিষ খেয়ে দেশের কত মানুষ যে মরেছে! নতুন আইনে ওদেরই প্রথম বিচার হল। সারা দেশ থেকে কয়েক জনকে ভার দেওয়া হয়েছিল বিচারের জন্যে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সব প্রদেশের এক-এক জন। পাহাড়ীদের তরফ থেকে আমাকে আসতে হল।"

"তুমি! তুমি গুলাব প্রধান—তুমি এলে এই বিচার করতে! তুমি হুকুম দিয়ে এলে ঐভাবে ঐ মানুষ দুটোকে মারবার জন্যে!"

শান্তনু রুদ্র আর কিছু বলতেই পারলেন না। কি জানি কেন নিজের দুটো চোখ শক্ত করে বুজে ফেললেন। সারা মুখখানা তাঁর নীল হয়ে উঠল। ঘরের অন্য সবাই এক তিল নড়ল না, যে যেভাবে ছিল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রধানজী। হালকা সুরে বলতে লাগলেন ঃ

"আমি কেন হুকুম দিতে যাব মারবার জন্যে। কোনও হুকুম

দেবার জন্যে তো আমরা আসি নি। দু দিন ধরে সমানে আমাদের শুনতে হয়েছে ওদের শয়তানির ফিরিস্তি। ওরা নিজেরাই নিজেদের সব অপকর্ম মনপ্রাণ উজাড় করে কবুল করলে। আমরা শুধু বলে এলাম, ওরা ভেজাল দেবার দায়ে দোষী। সুতরাং ওরা দেশের শত্রু। এখন ওরা ফল ভোগ করবে দেশের লোকের সঙ্গে শত্রুতা করার। নতুন আইনে সরকার আর কিছুই করবেন না। দেশের মানুষের হাতে ওদের ছেড়ে দেবেন।”

আর্তনাদ করে উঠলেন রুদ্রমশাই ঃ

“শুনলে? শুনলে নীলকণ্ঠ? দেশের মানুষের হাতে ওদের ছেড়ে দেবার আইন তৈরী হয়েছে। দেশের মানুষে ওদের নিয়ে গেল। কি দশা হবে ওদের?”

ঈশ্বরের দিক থেকে নজর নামালেন নীলকণ্ঠ বাঁড়ুজ্যে। আকুল ভাবে তাকালেন প্রত্যেকের মুখের দিকে। তার পর অসহায় ভাবে মাথাটা দু বার নাড়িয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

এবার শুনতে পাওয়া গেল ইন্দুমতীর কণ্ঠস্বর। ঝড়ের বেগে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

“কি আবার হবে, মরবে। কত শিশু, কত নিরপরাধ অসহায় রুগী মরেছে ওদের জন্যে। এবার ওরা ফল ভোগ করবে। ওদের রাক্ষুসে খিদে নয়তো কিছুতে ঘুচত না। চোর ডাকাত খুনে সব দেশে চিরকাল আছে,—হয়তো তারা থাকবেও চিরকাল সব সমাজে। সমাজে বাস করতে গেলে আইন মেনে চলতে হয়। তা তারা পারে না। তাই তাদের সাধারণ আইনে বিচার হবে। আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে। সাজা ভোগ করবার পর আবার তাদের সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে তারা মানুষের মত সমাজে বাস করতে পারে। কিন্তু ঐ রাক্ষসরা, ওরা চোর-ডাকাত নয়। চোর-ডাকাতরা সারা দেশসুদ্ধ মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে না। তারা করে অপরাধ। আর এরা করে শত্রুতা। এই শত্রুদের কোনও

শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলে এরা আরও চরম শত্রুতা করার মতলব ঠাওরাবে সারা দেশের সব-কটা মানুষের সঙ্গে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শত্রু নিকেশ করার অধিকার পেয়েছে আজ দেশের মানুষ। আজ তারা ছাড়বে কেন ?”

এতক্ষণ একখানি ছবি আটকানো ছিল দরজার ফ্রেমে। ফ্রেমে আঁটা ছবির মতই তাকিয়ে ছিল প্রধানজীর মুখের দিকে। ছবিখানি এবার নড়ে উঠল। আলতো ভাবে পা ফেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল প্রধানজীর সামনে। আলতো ভাবে জিজ্ঞাসা করলে প্রধানজীকে :

“বিচার তো করে এলেন, কিন্তু বিচারে যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে ?”

জবাব দিলে কল্যাণ। গুরুগম্ভীর চালে বক্তৃতা দেবার মত করে বলতে লাগল :

“সে উপায় আর নেই। ওই চালাকিটি আর চলবে না। এ বিচারে উকিল নেই জেরাজেরি নেই, সোজা ব্যাপারকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জট পাকাবার গরজ নেই কারও। এ বিচারে পয়সা রোজগারের ফন্দি আঁটতে পারে না কেউ। চরম শাস্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অতি বীভৎস পরিণাম জেনেও, দুষ্কৃতিকারী নিজের সমস্ত অপকর্মের ইতিহাস আগাগোড়া বর্ণনা করে যায়। কিছুই লুকোয় না। কিছুই লুকোবার আর উপায় নেই।”

সাদা চুল-দাড়িওয়ালা যে ভদ্রলোকটিকে নীলকণ্ঠ বলে ডেকেছিলেন রুদ্রমশাই, তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। ভয়াবহ কিছু দেখলে যেমন আঁতকে ওঠে মানুষে, তেমনি ভাবে আঁতকে উঠলেন।

“কেন ? কেন তারা কবুল করছে সব ?···সত্যযুগ আবার ফিরে এল নাকি ?”

মুহূর্তের জন্যে থামলে কল্যাণ। তার পর তার বক্তৃতা চালিয়ে গেল :

"কবুল না করে উপায় নেই বলে। আজ দেশে এমন এক শক্তিমান বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি মানুষের মনের ছবি তুলতে পারেন। অত্যাশ্চর্য এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন তিনি। ভয়াল ভবিতব্যের চেয়ে ক্ষমাহীন সে যন্ত্র, কুটিল মহাকালের চেয়ে নির্মম সেই যন্ত্রের মহিমা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতে যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে বিচিত্র বোধ হয় মানুষের মন। যে মনকে বৈশ্বানর পোড়াতে পারে না। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের অব্যর্থ যন্ত্রের অমোঘ দৃষ্টিশক্তি বৈশ্বানরকেও হার মানিয়েছে। সেই যন্ত্রের খপ্পরে পড়লে খাপ্পা খাঁ খবিশ্‌কেও অন্তর উজাড় করে দিতে হয়। খানাতল্লাশ করবার মোটে দরকার-ই হয় না।"

রুদ্রমশাই যেন তলিয়ে গিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। অনেক দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ঃ

"কে সে ? কি নাম সেই বৈজ্ঞানিকের ?"

জবাব দিলেন প্রধানজী। খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"তা কিন্তু কেউ জানে না। বলবার উপায় নেই। সকলে তাঁর পরিচয় জেনে ফেললে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল হবে। শত্রুরা তাঁকে শেষ করে ফেলবে যে। কাজেই গভর্নমেণ্ট সর্বরকম ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তাঁর পরিচয় কেউ না পায়। যাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দেশের শাসনকর্তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন, ঘুষ, ভেজাল, ধরাধরি লোপ পেতে বসেছে দেশ থেকে, দেশের মানুষের হাড়ে বাতাস লেগেছে, তাঁকে রক্ষা করতে হবে তো! সরকার এতটুকু ত্রুটি করেন নি সে ব্যবস্থা করতে। কোনও মতেই কেউ তাঁর সন্ধান পাবে না।"

"পাবে না!"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন রুদ্রমশাই। ভয়ানক অন্যমনস্কও হয়ে পড়লেন। নীলকণ্ঠের দিকে ফিরে বললেন ঃ

"তবে তো সাংঘাতিক কথা হয়ে দাঁড়াল, কি বল নীলকণ্ঠ? সে বেচারাকে মরে বেঁচে থাকতে হবে যে তা হলে! তার বাপ মা স্ত্রী, ধর যদি একটি স্ত্রী থাকে তার, কেউ জানতে পারবে না কোথায় আছে সে, কেমন আছে। এ যে ভয়ানক কথা নীলকণ্ঠ। তুমি, তোমার ঐ মেয়ে, তোমরা গান গাও। গান শিখেছ তোমরা, গানের মধ্যে ডুবে আছ। আর সেই বৈজ্ঞানিক ডুবে আছে মানুষের মনের মধ্যে। গান আর মন, মন আর গান, বাঃ বেশ চমৎকার মিলছে। কিন্তু আমরা, আমরা গানও জানি না, মন পড়তেও শিখি নি, আমরা বেঁচে থাকব কেমন করে নীলকণ্ঠ? কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমরা?

কেমন যেন হেঁয়ালির মত শোনাল রুদ্রমশায়ের কথাগুলো, কাকে উদ্দেশ করে কি যে তিনি বললেন, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু ফল হল, নীলকণ্ঠের কন্যা ছুটে গিয়ে ধরে ফেললে রুদ্র-মশায়ের হাত একখানা। ধরে বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল:

"হবে না, কিছুতেই তা হতে দোব না। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বাঁড়ুজ্যের মেয়ে যদি হই আমি, সত্যিই যদি বাবার কাছ থেকে কিছু শিখতে পেরে থাকি, তা হলে কথা দিচ্ছি আপনাকে, কিছুতেই সেই বৈজ্ঞানিককে লুকিয়ে থাকতে দেব না।"

চমকে উঠে তাকালেন এক বার মেয়ের দিকে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বাঁড়ুজ্যে। রহস্যময় সুরে বললেন:

"জ্ঞানের চেয়ে বড় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের চেয়ে বড় কি শান্তনু? জ্ঞানলোক, বিজ্ঞানলোক তার পর আনন্দময়লোক। কি জানি, সেই আনন্দময়লোকের সন্ধান পেয়েছি কি না আমরা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে ঢের বড় সঙ্গীত, সঙ্গীতের স্থান আনন্দময়লোকে। দেখা যাক্, মেয়ে আমার কত দূর কি করতে পারে। আচ্ছা, আজ চলি শান্তনু। আয় মা আয়, অনেক বেলা হয়ে গেল। সন্ধ্যা-আহ্নিক সারতে পারি নি আজ—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই, নীলকণ্ঠের মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন :

"ভুলে যাস নি মা, ভুলে যাস নি কি প্রতিজ্ঞা করে গেলি।"

মেয়েটি কোন জবাব দিলে না, হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় ছোঁয়ালে। তার পর ইন্দুমতীর কাছে গিয়ে তাঁর পায়েও হাত ছোঁয়ালে। ইন্দুমতী কিছুই বললেন না, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। অল্প একটু কেঁপে উঠল তাঁর ঠোঁট দুখানি, নিঃশব্দে আশীর্বাদই করলেন বোধ হয়। তার পর ওরা পিতাপুত্রী দু জন চলে গেল ঘর ছেড়ে। বিচিত্র সুরে আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে গেলেন পণ্ডিতজী।

"কালো লি করুতে ভবান সর্বলোকে শুভাশুভান্।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সর্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ॥"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত গমগম করতে লাগল পণ্ডিতজীর কণ্ঠস্বর, অনেকটা সময় কেটে গেল সে সুরের রেশ মেলাতে। তার পর মুখ তুলে তাকালেন রুদ্রমশাই গুলাব প্রধানের দিকে। বললেন :

"চিনতে পারলে গুলাব ওদের ?"

প্রধানজী মাথা নেড়ে বললেন :

"আগে কখনও দেখি নি তো, শুধু নামই শুনেছি। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কে না শুনেছে।"

কল্যাণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল :

"আর ঐ হিয়া বাঁড়ুজ্যে। বাপের চেয়ে মেয়ের নাম এখন অনেক বেশী।"

রুদ্রমশাই হেসে ফেললেন। বললেন :

"তাই তো আজকাল নিয়ম হয়েছে হে। ছেলেমেয়েরা মা-বাপের চেয়ে বেশী নামজাদা হয়। তার পর যত পারে

বাপ-মাকে কাঁদায়। কান্না, শুধু কান্না, চারিদিকেই কান্নার রোল। ছেলেমেয়ে জন্মাবার সময় কান্না, তাদের বড় করে তুলতে হলে কান্না, তারা বড় হয়ে উঠলে কান্না। সংসারটাই কান্না দিয়ে গড়া। এই কান্নার সমুদ্রের মাঝে নীলকণ্ঠ আনন্দময়লোকের স্বপ্ন দেখে। এই সংসারটাকেই ওরা আনন্দময়লোক করে তুলবে। ওরা বিশ্বাস করে, সঙ্গীতের নাকি এত বড় শক্তি আছে, যা দিয়ে বনের পশু বশ করা যায়। বনের পশুর চেয়ে মানুষ কিছু বেশী হিংস্র নয়। কাজেই মানুষকে বশ করা যাবে না কেন? তোমরা বিচার করে সাজা দিয়ে যা না করতে পারবে, ওরা তা শুধু সঙ্গীতের দ্বারা সমাধা করে ফেলবে। তা ওরা পারবেও গুলাব, নিশ্চয়ই পারবে। আমার মত মানুষকে ওরা গান গেয়ে শান্ত করে রাখে। যখন খেয়াল হয় কি হারিয়েছি আমি, যখন হিসেব করতে বসি সে জিনিস আজ আমার হাতে থাকলে কি হতে পারতাম আমি, এই দুনিয়ার রূপটা কি ভাবে পালটে দিতাম, তখন বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে দাউ-দাউ করে। তখন—তখন ওরা—মানে ঐ নীলকণ্ঠ আর ঐ মেয়ে, ওরা যদি কাছে থাকে, তা হলে গান শুনিয়ে আমায় ভুলিয়ে দেয়। এ দুনিয়ার মান-অপমান লাভ-লোকসান বিড়ম্বনা-বঞ্চনা সব ভুলে যাই। তখন কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী, আর কে কার সন্তান! সুরে সুরে এমন এক সুরলোক সৃষ্টি করে ওরা, সেই সুরলোকের অন্তরে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলি নিজেকে যে তখন আর কোনও জ্ঞানও থাকে না। তখন—”

আরও কিছু বলতেন হয়তো রুদ্রমশাই সঙ্গীতের শক্তি সম্বন্ধে, কিন্তু বলতে পারলেন না। বাধা পড়ল। ইন্দুমতী হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন ঃ

“থাম থাম। কাঁহাতক আবোল-তাবোল শুনব মুখ বুজে? এতই যদি শক্তি গানের, তা হলে তোমার ছেলেকে আটকাতে

পারলে না কেন ? কিসের লোভে তোমার ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ?···কি অভাব ছিল তার ?"

রুদ্রমশাই আমতা আমতা করে কি যেন জবাব দিতে গেলেন। ঢাকা পড়ে গেল তাঁর গলার আওয়াজ। আবার একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ উঠল কোথায়। আবার সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটল কল্যাণ। হল্লাটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ানক রকম ঘাবড়ে গেলেন রুদ্রমশাই। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলা হয়ে উঠল। এক বার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ওঁরা তখন মুখ নীচু করে তাকিয়ে আছেন মেঝের ওপর, কান পেতে শুনছেন বাইরের হট্টগোলটা। বোধ হয় আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন কিছু। বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। আন্দাজ বে-আন্দাজের বেড়া ডিঙ্গিয়ে বন্যার জলের মত উন্মত্ত মানুষের পাল ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়ির ওপর। বাইরে মুহুর্মুহু গগনভেদী চিৎকার উঠল ঃ

"মানতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। হিয়া বাঁড়ুজ্যেকে চাই। হিয়া বাঁড়ুজ্যেকে না হলে আমাদের চলবে না।"

এক দল চির-উপোসী প্রেত যেন হাহাকার করে কাঁদছে।

সেই প্রেতকান্না চলতেই লাগল বাড়ির বাইরে। ঘরে ঢুকলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর কন্যা। মেয়েই বাপের হাত ধরে নিয়ে এল। পণ্ডিতজীর গরদের কাপড় চাদর যা-তা হয়ে গেছে, চুল-দাড়ির দশাও তদ্রূপ। মেয়ের কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও সেই রকম। এমনভাবে হাঁপাচ্ছেন পণ্ডিতজী, বুঝি দম আটকে যায় একেবারে। মেয়েও হাঁপাচ্ছে, তবে বাপের মত অতটা নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকেই বাঁড়ুজ্যে মশাই মেঝেয় বসে পড়লেন, মেয়ে তখনও ধরে আছে বাপকে। দু জনের কারও কথা বলার সামর্থ্য নেই। ঘরের ভেতর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও যেন

জমে পাথর হয়ে গেছেন। এক চুল নড়ার শক্তি হল না কারও। তিন জনেই পুতুলের মত তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

বাইরে কে বিকট আর্তনাদ করে উঠল। দাবি-দাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল সেই ভয়াবহ আর্তনাদটা। গুলাব প্রধান এক টানে বার করলেন তাঁর ভোজালিখানা কোমরে বাঁধা খাপ থেকে, নিমেষের জন্যে একটা ঝিলিক খেলে গেল হাওয়ায়। তার পর ভোজালিসুদ্ধ প্রধানজীকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

বুকফাটা চিৎকার করে উঠলেন রুদ্রমশাই :

"গুলাব, গুলাব প্রধান।"

প্রচণ্ড গোলমালের ভেতর রুদ্রমশায়ের গলা ডুবে গেল।

তার পর সব গোলমাল সমস্ত হট্টগোল নিঃশেষে উবে গেল হঠাৎ। কয়েক মুহূর্ত পরে আড় হয়ে ঘরে ঢুকলেন প্রধানজী কল্যাণের দেহটা হাতের ওপর নিয়ে। ঘরের মাঝখানে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেয় শুইয়ে দিলেন কল্যাণকে।

"হা হা হা হা—"

বিশ্রীভাবে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠলেন ইন্দুমতী। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বসে পড়লেন কল্যাণের মাথার কাছে। বসে মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। মুখ ফিরিয়ে রুদ্রমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন :

"সঙ্গীত, সঙ্গীতের শক্তিতে বনের পশু বশ হয়, মানুষ বশ হবে না কেন। সঙ্গীতের কত বড় শক্তি তার প্রমাণ পেয়েছ? সঙ্গীতের শক্তি দিয়ে নরপশুদের বশ করতে পারলে না এরা!"

অনেকক্ষণ আর টুঁ শব্দটি করতে পারল না কেউ। মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারল না কেউ ইন্দুমতীর মুখের দিকে। শুধু প্রধানজী ছুটোছুটি করে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ভেতর থেকে একটা কুঁজো এনে কল্যাণের মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। আঁচল দিয়ে মুখের ওপর বাতাস দিতে লাগলেন

ইন্দুমতী। তার পর কল্যাণ সামান্য একটু কাতরে উঠল। প্রধানজী তাড়াতাড়ি তাকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন।

অবশেষে মাথা তুললেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক খালি করে অনেকক্ষণ ধরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ফেলে কোনও রকমে নিজেকে খাড়া করে তুললেন। ঘেন্নায় লজ্জায় ক্ষোভে মুখ থেকে কথা সরছে না তখন তাঁর। কোনও রকমে বলতে পারলেন ঃ

"চল শান্তনু, চল আমরা পালাই এখান থেকে।"

চমক ভাঙল রুদ্রমশায়ের। বললেন ঃ

"কোথায় ?"

"যেখানে দু চোখ যায়।"

বললেন ইন্দুমতী।

"হ্যাঁ শান্তনু, যেখানে দু চোখ যায়। না না, তা নয় তা নয়। চল আমরা এমন কোথাও যাই যেখানে মানুষ নেই। মানুষের গলার আওয়াজ যেখানে শুনতে পাওয়া যায় না, সেখানে চল। বনের পশুপাখিরা কি দাবি জানাতে জানে শান্তনু ? চল, আমরা সেখানে যাই, থাকি গে বনের পশুপাখিদের ভেতর লুকিয়ে। দাবি দাবি দাবি, দাবি আব শুনতে হবে না। দাবির হ্যাংলাপনা আর সহ্য করতে হবে না তা হলে। ইস্! দাবির বহর কত দুর পৌঁচেছে জান শান্তনু ? তোমার এখান থেকে পা দিতেই ওরা আমাদের ঘিরে ধরল। দুটো মানুষকে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছে ওরা। তাদের দেহ দুটোকে টাঙিয়েছে চৌরাস্তার মোড়ে টেলিগ্রাফ পোস্টে। তার তলায় ওরা আজ আমোদ-আহ্লাদ করবে। নৃত্য গীত বাদ্য বক্তৃতা, আজ যে একটা স্মরণীয় দিন কিনা। দেশসুদ্ধ মানুষ প্রকাশ্যে মানুষ-শিকারের অধিকার পেয়েছে যে আজ ! তাই ওদের গান শোনাতে হবে আজ আমাদের সেই টাঙানো মড়া দুটোর তলায় বসে।

আমরা বললাম, পারব না। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু ওরা তা শুনবে কেন? আজ যে জাতীয় উৎসব, আজ ওদের দাবি না মানলে ওরা ছাড়বে কেন! টানা-হেঁচড়া জুড়ে দিলে। কোনও রকমে তোমার দরজা পর্যন্ত ছুটে এলাম মেয়ের হাত ধরে। দরজাটা আর পেরোতে পারলাম না। পারতামও না যদি ঠিক সেই সময় ঐ ছেলেটি না ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের ওপর। এতক্ষণে সেই হ্যাংলা কুকুরের দল মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে যে কি হাল করত—"

থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন বাঁড়ুজ্যেমশাই। বলতে বলতে বার বার শিউরে উঠলেন। আর এক বর্ণও তাঁর মুখ দিয়ে বার হল না।

গুলাব প্রধান এতক্ষণ কল্যাণকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এবার তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রুদ্রমশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"তাই চলুন রুদ্রজী। এখানে বোধ হয় আপনারা আর থাকতে পারবেন না। এখন ওরা পালিয়েছে, আবার ওরা হয়তো দলবল জুটিয়ে ফিরে আসবে।"

ইন্দুমতী সর্বাগ্রে সম্মতি দিলেন। সম্মতি দেওয়া নয়, করুণ আবেদন করলেন যেন তিনি। বললেন:

"তাই করুন ঠাকুরপো। আপনি আমায় ভাবীজী বলে ডেকেছেন। আমার দেওর নেই, ও ডাকে কেউ আমায় ডাকে নি কখনও। সত্যিকারের দেওরের কাজ করুন ভাই, সরিয়ে নিয়ে চলুন এখান থেকে। নয় তো আমার ঐ অভাগী মেয়েটাকে আমি রক্ষা করতে পারব না। ওর মা নেই, সেই ছোটবেলা থেকে আমাকেই ও মা বলে জানে, মা বলে ডাকে।"

গুলাব প্রধান মহাখুশী হয়ে উঠলেন। দু হাত কচলাতে কচলাতে বললেন:

"সেই কথাই তা হলে ঠিক ভাবীজী। কি জন্যে পড়ে থাকবেন এখানে ? চলুন আমার ওখানে আপনারা, পাহাড় বরফ গাছপালা ফুল, জঙ্গল ভরা ফুল। আর সেই পাহাড়ী মানুষ। আমার মত বোকা মানুষ সব। কেউ কাকেও ঠকাতে শেখে নি এখনও। তাদের দাবির মধ্যে শুধু রুটি আর শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কিছু কাপড় কম্বল। ব্যাস—এই জুটলেই তাদের মুখে হাসি উপচে পড়ে। চলুন আমার ওখানে, দেখি কে আপনাদের অপমান করে।"

প্রধানজীর কথা শেষ হবার আগেই আড়মোড়া দিয়ে উঁ আঁ করতে করতে কল্যাণ উঠে বসল। দু হাতে দু চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে :

"দরকার নেই নেপালী দাদা, তোমার সেই নেপাল মুল্লুকে গিয়ে। এখানে এ ব্যাটারা মেরে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু কুকরি বার করে কাটতে তো আর আসে নি। তোমার দেশে এতক্ষণে যে কচুকাটা হয়ে যেতাম রে ভাই।"

কথাটা শুনে হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন প্রধানজী। এতক্ষণে ঘরের গুমোট আবহাওয়াটা যেন অনেক হালকা হয়ে গেল। সবায়ের মুখেই হাসি দেখা দিল। শুধু রুদ্রমশাই আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন। প্রধানজীর পাশে সরে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন :

"আমাদের কি তুমি নেপালেই নিয়ে যেতে চাও গুলাব ?"

গুলাব প্রধান সজোরে মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন :

"না না, নেপালে আমার আছে কি ? দার্জিলিং শহরে ছোট একটা কুঁড়ে আছে, সেখানেই থাকবেন আপনারা। চলুন কালই আমরা দার্জিলিং চলে যাই।"

দার্জিলিং।

দুর্জয়লিঙ্গের দুর্জয়ত্ব ঘুচিয়ে শৌখিন মানুষে দার্জিলিং বানিয়েছে। বিশ্বসংসারের যেখানে যত জাতের ফুল ফোটে, সব এনে লাগানো হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। ফুলের পাহাড় হল দার্জিলিং, ফুলের মত হালকা জায়গা। মনকে ফুলের মত হালকা করে নিয়ে তবে মানুষে দার্জিলিং যায়। সামনে দিগন্ত-জোড়া বরফ-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা, তবু দার্জিলিং গিয়ে হিমালয়কে—ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর—বলতে প্রবৃত্তি হবে না। দায়-দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে ছুটি-পাওয়া মন-মেজাজ দিয়ে দার্জিলিং যায় মানুষে, ছুটি ফুরোলে নেমে আসে। তাই দার্জিলিঙকে ছুটির দেশও বলা চলে।

মুসাফিরির জায়গা হল দার্জিলিং, দুনিয়ার মুসাফির জোটে দার্জিলিং পাহাড়ে। সব জাতের সব রকম ওজনের ব্যবস্থা আছে সেখানে। মহাসম্ভ্রান্ত যাঁরা তাঁদের জন্যে আছে গৌরীশৃঙ্গ পান্থশালা, অতি সাধারণদের জন্যে আছে খয়রাতী ধর্মশালা। জোটে সবাই, রাজা যান, রাজার খুড়ো রাজাবাহাদুরও যান। প্রজা যায়, প্রজার শালী প্রজাপতিও যায়। তার পর রাজায় প্রজায় মিলেমিশে যে বিচিত্র চিজ উৎপন্ন করেন, তা হল দার্জিলিং পাহাড়ের স্থায়ী সম্পদ। একদা রাজারা, রাজার খুড়োরা শখ করে বাড়ি ঘর দরজা বানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের অনুগ্রহভাজন অনেককে। দিয়ে উদ্ভট পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন হয়তো। এখনও দার্জিলিং পাহাড়ে সেই অনুগ্রহভাজনদের দেখা যায়। ওঁরা হলেন ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। দার্জিলিং ছেড়ে বড় একটা নামেন না সমতলভূমে। রাজা-রাজড়াদের দেওয়া দু-একখানি বাড়িঘর আছে অনেকের। মৌকা বুঝে মরসুমের সময় সেই সব বাড়িঘর ভাড়া দিয়ে তাঁদের সারা বছরের জীবনধারণ চলে।

বিচিত্র জীবনচরিত এঁদের, যা না শুনে রেহাই নেই কারও। সামান্য একটু আলাপ, এক বার একটু মুখ-চেনাচিনি হলেই শুনতে হবে। শুনতে হবে, কবে কোন্ রাজার মামাতো ভায়রাভাই কি গুপ্তকথাটি বলেছিলেন কার কানে কানে, সার হুকুম সিং কি খেতে ভালবাসতেন, বিশ্ববরেণ্য কবির হৃদয়ে গোপন দুঃখটি কি ছিল, কার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গোবরাজোলের কুমার খাবি খেয়েছিলেন, কিংবা হোগ্‌লাগঞ্জের কড়ে রাঁড়ী রানীসাহেবার সঙ্গে মাম্‌দোবেড়ের রায়বাহাদুরের কি সম্বন্ধ ছিল। শুনতেই হবে, না শুনে কোনও উপায় নেই। সারা দেশটার যাবতীয় ঘরানা ঘরের হাঁড়ির সংবাদ সব এঁদের জানা।

দার্জিলিং জায়গাটার হাঁড়ির খবর কিন্তু কখনও বলেন না এঁরা। প্রাণপণে সেজেগুজে থাকেন দার্জিলিং পাহাড়ের স্থায়ী বাসিন্দারা, শ্মশানে যাবার সময়েও সঙ সেজে যান। মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসি, মিষ্টি-মিষ্টি আলাপ-আলোচনায় এঁদের ওপর-ভেতর ভরপুর। নাম-করা মানুষদের উপকার করে করে বেশ নামডাক হয়ে গেছে ওঁদের। নাম করলেই দার্জিলিঙের ঘোড়াওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালা থেকে বাজারের সব্‌জিওয়ালাটা পর্যন্ত সবাই চিনবে। চিনবে এঁদের অদ্ভুত নামের বাসস্থানগুলিকেও। যেমন, দার্জিলিং পেঁৗছে যদি কেউ 'অশরণ অলীক' নামটি উচ্চারণ করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ কেউ-না-কেউ ঠিক পথটি বাতলে দেবে। সবাই জানে 'অশরণ অলীক' কোথায়, ঐ বিশেষ নামের কটেজটিতে যিনি বাস করেন, তাঁকেও সকলে চেনে। এমন কি সেই কটেজে ক'খানি শোবার ঘর, ক'টি বাথরুম ভাড়া দেওয়া হয়, তাও সকলের মুখস্থ আছে। সুতরাং 'অশরণ অলীক' নামের কুটিরটিতে পেঁৗছতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। নির্জন স্থানে মনোরম পরিবেশে কাঠ টিন কাঁচ দিয়ে তৈরী ছোট্ট বাড়িটি পছন্দও হবে সকলের। বাড়ির মালিককে তো পছন্দ হবেই। মিসেস্ আতুরী চৌধুরীকে পছন্দ হয়

না কার! কোনও সময় ভদ্রমহিলাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখে নি কেউ। ঠোঁট ভুরু গাল চুল, সমস্ত যথাযথ রঙ্‌ করে নিয়ে মেমসাহেব দিবারাত্র অষ্টপ্রহর মানুষকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

মিসেস্‌ আতুরী চৌধুরী এবং তাঁর 'অশরণ অলীক' ভিলা দার্জিলিং পাহাড়ের বিখ্যাতস্থান। ভদ্রতার গণ্ডি ডিঙিয়ে যদি কোনও নেহাত অসভ্য মানুষ মিসেস্‌ চৌধুরীর ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চান, তবে খামকা ভদ্রমহিলাকে আঘাত দেওয়া হবে। কারণ নিজের পুরানো জীবনটা স্মরণ করতে গেলেই তিনি বড় কাহিল হয়ে পড়েন। ভয়ানক হোরিবল্‌ কি না সে সমস্ত এফেয়ার্স! সামান্য যেটুকু লোকমুখে প্রচারিত আছে তা থেকে এইটুকুই জানতে পারা যায় যে, মিস্টার চৌধুরী এখনও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন স্কটল্যাণ্ডের কোন পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর ওদেশী বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে। আর এধারে বেচারী মিসেস্‌ চৌধুরী—যাক্‌ গে—এ সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করার দরকারটাই বা কোথায়।

করেও না কেউ নাড়াচাড়া, দরকারও করে না করবার। মিসেস্‌ চৌধুরী সে সুযোগ দেন না। তাঁর ভিলায় যাঁরা পেয়িং-গেস্ট হন, আর যাঁরা তাঁর একান্ত হোম্‌লি ড্রইংরুমে বসে আগুনের তাপ গ্রহণ করেন ভাল জাতের কফি পান করতে করতে, তাঁরা সকলেই মিসেস্‌ চৌধুরীকে যথেষ্ট খাতির করেন। করতেই হবে যে, কত বড় বড় রাজা রাজাবাহাদুর সার লর্ড বসে গেছেন মিসেস্‌ চৌধুরীর ড্রইংরুমে, ওঁর ব্যবহারে কত রথী-মহারথীরা চার্মড্‌ হয়ে গেছেন, এই সমস্ত শুনলে কে না ওঁকে খাতির করবে!

সেই খাতিরটুকুও এবার খেলাপ হয়ে যায় বুঝি!

যা সব আজগুবী উদ্ভট খবরাখবর আসছে প্লেন থেকে। মিসেস্‌ চৌধুরীর কেমন যেন দম আটকে আসে সমতলভূমির সমস্যা-সমাকুল

সংবাদ সব শুনে। তবু তিনি চেষ্টা করছিলেন, নিজেকে স্থির রাখবার, প্রাণপণে বোঝাচ্ছিলেন—এসা দিন নেহি রহেগা। আবার ফিরে আসবে দার্জিলিঙের সুবর্ণযুগ, আমিরী মেজাজ নিয়ে আমির আদমিদের শুভাগমন হবে আবার পাহাড়ে। যাঁরা মিসেস্ চৌধুরীর মত মানুষের সঙ্গে সামাজিকতা করতে জানবেন, খাতির পেতে আর খাতির ফিরিয়ে দিতে যাঁরা ওয়াকিফহাল। টাকা-ওয়ালা মানুষরা যে আসেন না দার্জিলিঙে, তা নয়। বরং বলা উচিত, যাদের টাকা কম তারা মিসেস্ চৌধুরীর মত মানুষের ছায়াও ছুঁতে পারে না। কিন্তু টাকাই তো আর সব নয়, টাকাওয়ালা মানুষ আর আমির আদমিদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফরক। মিসেস্ চৌধুরী ঐ ফরকটুকু চট্ করে ধরে ফেলতে পারেন। পারলেও তিনি বরদাস্ত করেন টাকার গরম। যখন যেমন তখন তেমন, এই ভাবে কোনও ক্রমে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চলছিল তবু। এবার বুঝি সেটুকুও যায়!

যাবার কারণ হল, মিসেস্ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা হঠাৎ ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। না এসে আর যাবেই বা কোথায় বেচারা! যাবার স্থানই বা তার আছে কোথায় দুনিয়ায়! বাড়ি গাড়ি গয়না শাড়ি, সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে মেয়ে-জামায়ের। এখন নাকি আবার বিচার হবে। সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিল জামাই। অনেক কষ্টে অনেক রকমে নাজেহাল হয়ে উপযুক্ত জামাই জুটিয়েছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। নাম ডাক পদমর্যাদা বিয়ের সময় যা ছিল ছোকরাটির, বিয়ের পরে তা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বাড়ে অবশ্য উপযুক্ত শাশুড়ীর উপযুক্ত তদ্‌বিরের জোরে। শাশুড়ী চেষ্টা করছিলেন, মেয়ে-জামাইকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করার জন্যে। সে চেষ্টা প্রায় সার্থক হয়েও উঠেছিল। হেন কালে এই বিপত্তি! যা যাবার তা তো গেছেই, এখন মানসম্ভ্রমটুকু রক্ষা পেলে হয়!

মিসেস্ আতুরী চৌধুরী সত্যিই ভয়ানক আন্-ব্যালেন্স্ড্ হয়ে পড়েছিলেন। এইভাবে ক্রমাগত মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়লে মানুষ আর কাঁহাতক ভার সইতে পারে! তার ওপর কান্না, কান্না মানে একেবারে দার্জিলিং পাহাড়ের মনসুনের মত ব্যাপার। মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে সদা-সর্বক্ষণ মেয়ের মুখ, আর জল ঝরছে। অসহ্য, ইন্টলারেব্ল, একদম হোপলেস। মিসেস্ চৌধুরী এবার হয়তো পাগলই হয়ে যাবেন। কি ভাবে যে তিনি উদ্ধার পাবেন এই অক্ওয়ার্ড সিচুয়েশন থেকে, তাই ভাবতে ভাবতেই বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন।

কিন্তু পাগলই হোন আর যাই-হোন, প্রসাধন কর্মটি তিনি বজায় রাখবেনই শেষ পর্যন্ত। সেদিন সকালে প্রসাধনের শেষের দিকটুকু সেরে নিচ্ছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। শয়নকক্ষের ছু পাশে ছুখানি ছোট খাট, মাঝখানে আয়না-লাগানো প্রসাধনের টেবিল। একখানি খাটের ওপর নতমুখে বসে ছিল মেয়েটি। পাড়হীন সাদা কাপড়, নিরাভরণ ছুখানি হাত দেখা যাচ্ছিল শুধু। অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুলে ঢাকা পড়েছিল মুখ বুক সমস্ত। মূর্তিমতী হতাশা, দেখলেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁক করে ওঠে।

মিসেস্ চৌধুরী আয়নার সামনে একটু নুয়ে পাউডার কাজল সিঁছুরের ছোপ ধরাচ্ছিলেন তাঁর চোখে মুখে আর মেয়েকে বোঝাচ্ছিলেন। সামান্য একটু ঝাঁজ ছিল তাঁর কথায়, তবে সেটুকুকে বিরক্তি বললে অন্যায় বলা হবে। অত্যধিক রকম ফ্যাসাদে পড়ে গেলে ও রকম স্থর মানুষের গলা থেকে বেরিয়েই থাকে। বলছিলেন মিসেস চৌধুরী ঃ

"কাঁদছিস কেন? কেঁদে কার মন গলাবি? চোখের জলে নাকের জলে এক করলে কি লাভ হবে শুনি? থামা এবার তোর নাকে-কান্না। আগুন জ্বালা চোখে! এখনও সময় আছে, এখনও যদি ওদের সব-ক'টার বুকে আগুন জ্বালাতে পারিস, তা হলে সব

দিক রক্ষে পাবে। নয়তো সবাই মরবে একে একে। দুশমন যখন যাকে ধরবে, ঘাড় মটকে রক্ত খাবে। সবাই একজোট হয়ে এখনও যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে দুশমনের ঘাড়ে তবেই বাঁচোয়া। সেই চেষ্টা কর, আগুন জ্বালা, ওদের সকলের বুকে আগুন জ্বালা।”

নতমুখী মেয়েটি মুখ তুলল না, ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল ঃ

“কি দিয়ে ?”

ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস্ চৌধুরী। আড়চোখে মেয়ের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন ঃ

“কি দিয়ে ?···কি দিয়ে সেই হতভাগাকে পায়ের তলায় ফেলেছিলি ?···কি তোকে শেখাই নি আমি ? সবই খুইয়ে বসেছিস নাকি এই বয়সে ? আধখানা পৃথিবী ঢুঁড়ে নাচের মাস্টার আনিয়েছি তোর জন্যে। ঐ হতভাগা লোফারটাকে দেখে এমনই হাল হল তোর, যে সব ভুলে গেলি। দেশের প্রতিটি ভদ্রলোক তখন তোর নাম জানত। সবাই আশা করেছিল, নাচে তোর বিশ্বজোড়া খ্যাতি হবে। দিল্লী থেকে দু বার ডাক পেয়েছিলি কাল্চারল মিশনের সঙ্গে রাশ্যা ম্যারিকা যাওয়ার জন্যে। সব দু পায়ে ঠেলে ঘর করতে ছুটলি একটা ফানি ফেলার সঙ্গে। যাক্ গে যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। আবার বুক বাঁধ, নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দে। নিজের পায়ের গুণটুকু ভুলে যাস্ নি। ঐ পায়ের তলায় এনে ফেল সব ক'টাকে। একটা ধরা পড়েছে, ওরকম আরও কত রয়েছে, মিলওয়ালা ব্যাঙ্কওয়ালা কোম্পানিওয়ালা ফিল্মওয়ালা। ক'টাকে সামলাবে গভর্নমেণ্ট ? ওদের সকলের যদি ঘুম ভাঙাতে পারিস, তা হলে ওরা এই গভর্নমেণ্টেরই ঘাড় মটকে ছাড়বে।”

এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতাতেও মেয়েটি একটু তাতল না। শক্ত

করে একটি নিঃশ্বাস ফেললে শুধু। ফেলে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

তেতে উঠলেন মা, তাঁর গলায় আরও একটু ঝাঁজ ফুটল। দম নিয়ে মেয়ের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন :

"তোর চেয়ে একটা ইঁদুরেরও মান-ইজ্জত বেশী। খাঁচায় বন্ধ করে খোঁচাতে থাকলে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে খাঁচার শিক। আর তুই শুধু কাঁদতে জানিস। যারা তোর এত বড় সর্বনাশটা করলে, তারা হাসবে। আর তুই কাঁদবি! যা যা, সরে যা সামনে থেকে। কান্না দেখলে শরীর জ্বলে ওঠে আমার। যাদের কাছে কাঁদলে কান্নার ফল ফলবে, তাদের কাছে যা।"

আস্তে আস্তে খাট থেকে মেঝেয় নেমে দাঁড়াল মেয়েটি, তার পর আঁচল লোটাতে লোটাতে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের পেছন দিকে মিসেস্ চৌধুরী। দরজা পার হয়ে যায় দেখে আর থাকতে পারলেন না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন :

"কোথায় চললি ?"

থমকে দাঁড়াল মেয়ে, মায়ের দিকে মুখ ফেরাল না। এক হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলোকে একপাশে সরিয়ে বললে :

"পারব না মা, আমি আর কিছুতেই এ নোংরা ব্যাপারে নিজেকে জড়াব না।"

ফোঁস করে উঠলেন মিসেস্ চৌধুরী :

"নোংরা ব্যাপার !"

দুই চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে লাগল, প্রচুর উঁচু বুক ওঠা-নামা করতে লাগল। আর এক বার দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন :

"নোংরা ব্যাপার !"

তার পর এক পা এগিয়ে এসে টিপে টিপে বলতে লাগলেন :

"এতকাল বুঝি জানতে পারিস নি কিছু নোংরা ব্যাপারের? আট শ টাকা মাইনে পেয়ে নিত্য নতুন গাড়ি, হাজার হাজার টাকা দামের শাড়ি গয়না, রোজ রাত্তিরে একগুষ্টি নচ্ছার-নচ্ছারনীকে নিয়ে হোটেলে হোটেলে নাচ গান স্ফূর্তি, এ সমস্ত জুটছিল কি করে, জানতে পারিস নি বুঝি? ঘর-বাড়ি হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ধুঁকে মরেছে, আর তাদের হাড়গোড় নিয়ে তোরা মজা লুটেছিস। কুবেরের ভাণ্ডার থেকে টাকা এনে সে হতভাগা তোর মন যোগাত না?...চোরের বউয়ের বড় গলা, কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি।"

থামতে হল মিসেস্ চৌধুরীকে, দমে আর কুলোল না। মায়ের দিকে পেছন ফিরে মেয়েও দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে, চোখ বুজে মুখখানি ওপর দিকে তুলে দম বন্ধ করে রইল। মুখের কথাকে গলার কায়দায় কত দূর পর্যন্ত বিষিয়ে তোলা যায়, তাই বোধ হয় সে অনুভব করতে লাগল মর্মে মর্মে।

মিসেস্ চৌধুরী আবার পেছন ফিরলেন, আয়নার সামনে নুয়ে শেষবারের মত পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিলেন মুখে। মুখখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন ভাল করে আয়নায়, কোথাও কোনও খুঁত থেকে গেল কিনা। আয়নায় নিজের ছায়াকেই শোনাতে লাগলেন:

"ন্যাকামি রাখ এখন, যা বলছি শোন। একটু পরে মিস্টার খাঁ আসবেন। চায়ে নেমতন্ন করেছি তাঁকে, মনে আছে তো! কাপড়-চোপড় বদলে নে।...মিস্টার খাঁ যদি হাতে থাকেন তা হলে হয়তো—"

মেয়েটির সারা শরীরটা কয়েক বার কেঁপে উঠল। কয়েক বার সে ঝাঁকানি দিল মাথায়, চোখ কিন্তু খুলল না। বুক-ভাঙা আর্তনাদ করে উঠল:

"এবার আমায় রেহাই দাও মা। এক বার যে ভুল করেছি, আবার সে ভুল কিছুতে আমি করব না। সে আমায় ঠকিয়েছিল।

বলেছিল—নানা ব্যবসায় তার টাকা খাটছে। সেই সব ব্যবসার লাভ থেকে অত টাকা আনছে সে। তাকে আমি দেবতা ভেবেছিলাম, শয়তান দেবতার ভেক্ ধরে আমায় ঠকিয়েছে। আর—আর আমি কোনও শয়তানের ফাঁদে পা দেব না। যত কাল বেঁচে থাকব, ভিক্ষে করে খাব।"

সাঁ করে ফিরে দাঁড়ালেন মিসেস্ চৌধুরী, হাঁ করলেন কি বলবার জন্যে। মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। নজর পড়ল দরজার ওপর। মেয়ে তাঁর চোখ বুজে আছে, তাই দেখতে পাচ্ছে না। মেয়ের পেছন থেকে মা কিন্তু দেখতে পেলেন। দেখলেন, আপাদমস্তক নিখুঁত সাহেবী সাজে সজ্জিত দীর্ঘ এক পুরুষ মেয়ের ঠিক এক হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বোবা বেদনার সাকার রূপটি হঠাৎ চোখের সামনে ফুটে উঠলে বোধ হয় বোবা-ই হয়ে যায় মানুষ। বোবাই হয়ে গেছে লোকটি, বোবা হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাকিয়ে আছে মেয়েটির মুখের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে মিসেস্ চৌধুরী নিজেকে সামলে নিলেন। অমায়িক হাসিতে তাঁর মুখটা একটু কুঁচকে উঠল, গলার স্বরও গেল পালটে। ঠোকাঠুকি লেগে কাঁচের গেলাস ভাঙল যেন কতকগুলো, এমন ধারা আওয়াজ বার করলেন তিনি গলা থেকে। বলে উঠলেন:

"আরে মিস্টার খাঁ যে! এসে পড়েছেন! কই জানতে পারি নি তো কিছু!"

চমকে উঠল দু জনেই। চোখ চেয়ে এক হাত সামনে মিস্টার খাঁকে দেখে এক পাশে সরে দাঁড়াল মেয়ে। মিস্টার খাঁ দরজার ওপর থেকে নড়লেন না। টুপিসুদ্ধ মাথাটা নুইয়ে ভদ্রতা রক্ষা করলেন। তার পর তাঁর মস্ত বড় কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন এক তাড়া নোট। মাকে কিছুই বললেন না, মেয়ের দিকে ফিরে খুবই শুষ্ক স্বরে বললেন:

"টাকাগুলো রাখ ভাস্বতী, তোমার কাজে লাগতে পারে হয়তো—"

বলে নোটের তাড়াটা মেয়ের পায়ের কাছে ফেলে দিলেন।

মিসেস্ চৌধুরী একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন :

"তার মানে! হঠাৎ এ ভাবে—"

মিস্টার খাঁ একান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন :

"হ্যাঁ, হঠাৎ ঠিক করে ফেলতে হল। এখনই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, তাই ভাস্বতীকে কিছু দিয়ে গেলাম। একটু বুঝে চললে ওতে ওর অনেক কাজ হবে। আর হয়তো কারও কাছে হাত পাততে হবে না জীবনে। ওর স্বামী আমার বন্ধু ছিল। তার ওপরওয়ালা ছিলাম আমি। কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আচ্ছা—চলি ভাস্বতী, আর দেখা হবে না হয়তো। মন খারাপ করো না লক্ষ্মীটি। গুড বাই, গুড—"

আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ভাস্বতী :

"কোথায় যাচ্ছেন আপনি এভাবে—"

ঘুরে দাঁড়ালেন আবার মিস্টার খাঁ, যতটা সম্ভব হাসি-হাসি গলায় বললেন :

"তা কি এখন বলতে পারি বোকা মেয়ে। লুকিয়ে থাকতে হবে, যেভাবে হোক লুকিয়ে থাকতে হবে। যতক্ষণ সম্ভব, চেষ্টা করি তো—"

মিসেস্ চৌধুরী বেসামাল হয়ে পড়লেন এবার। চোখ বড়-বড় করে বলে উঠলেন :

"তার মানে! আপনাকে—"

"এক যাত্রায় কি পৃথক ফল ফলে মিসেস্ চৌধুরী? আচ্ছা, গুড বাই। হোপ ইউ গুড লাক—"

মিস্টার খাঁর কণ্ঠস্বর দরজার ওধারে মিলিয়ে গেল।

এক তাড়া নোট পড়ে রইল মা-মেয়ের মাঝখানে। ভূত দেখলে

মানুষের চোখ-মুখের অবস্থা যেমন হয়, তেমনি চোখ-মুখ করে ওঁরা তাকিয়ে রইলেন তাড়াটার দিকে, সেটাকে ছোঁবারও সাহস হল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল, জানলার শার্সিগুলো ক্রমশঃ ঘোলা হয়ে উঠছে। মেঘ জমছে বাইরে, দার্জিলিঙের মেঘ। যে মেঘ ওপর থেকে নীচে নামে না, নীচে থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপর দিকে ওঠে। দার্জিলিঙের মেঘ হল দার্জিলিঙের অনেক নীচের সমতলভূমির হা-হুতাশ। স্পষ্ট দেখা যায়, রাশি রাশি পেঁজা তুলো তালগোল পাকিয়ে উঠে আসছে ওপর দিকে। আকাশ নীল, রোদ চকচক করছে চতুর্দিকে, চোখের সামনে জ্বলছে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ-ঢাকা চূড়োগুলো। হঠাৎ নীচে থেকে একখানা পর্দা ওপর দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। ঢাকা পড়ে গেল সব, অনেক নীচের জেলখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন আগে লোপাট হয়ে গেল। তার পর বাজার, রেল স্টেশন, কার্ট রোড, ওধারে রাজ্যপালের বাড়ি, এধারে বর্ধমান প্যালেস, সব মুছে সাফ হয়ে গেল। সমতলভূমির হা-হুতাশ ক্রমে গ্রাস করে ফেললে সমস্ত দার্জিলিং শহরটাকে। হিমালয়ের গা থেকে দার্জিলিং নামটাই একেবারে মুছে দিলে।

মিসেস্ আহুরী চৌধুরী এবং তাঁর কন্যা ভাস্বতী অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন আস্তে আস্তে। জানালার শার্সির বাইরে দার্জিলিঙের মেঘ ক্রমশই ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

তার পর আরম্ভ হল জল। মেঘ থেকে জল ঝরে, তার নাম বৃষ্টি। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া যাকে বলে, সে ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে দার্জিলিঙে। ওখানের বৃষ্টিতে পড়া ব্যাপারটি নেই। বৃষ্টি হয়, সমস্ত মেঘ হঠাৎ জলে পরিণত হয়। হুড়মুড় হুড়হুড় করে জলটা ছোটাছুটি করে চতুর্দিকে। এর নাম দার্জিলিঙের বৃষ্টি। কাজেই একে ঠিক বৃষ্টি পড়া বলা চলে না, বৃষ্টি পড়ছে না বলে জল হচ্ছে বললেই ঠিক বলা হয়।

চড়বড় চড়বড় আওয়াজ উঠল মিসেস্ চৌধুরীর 'অশরণ অলীক' ভিলার টিনের ছাতে। জানালার শার্সিগুলো ঝনঝন করে উঠল প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাটে। ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতির মধ্যে হঠাৎ আর এক জাতের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দশ-বিশ জোড়া বুট জুতো যেন দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছে বাড়ির মধ্যে। কাঠের মেঝের ওপর সবুট পদক্ষেপ বুঝতে মোটেই ভুল হল না মা-মেয়ের। নিমেষের জন্য মিসেস্ চৌধুরী একটু আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। তার পরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন নোটের তাড়াটার ওপর। ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে যেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি শোনা গেল ভারী কণ্ঠস্বর দরজার বাইরে :

"মাপ করবেন, অসময়ে বিরক্ত করলাম আপনাদের।"

গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত বর্ষাতি-ঢাকা জনাকয়েক মানুষ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। গোদা-গোদা রবারের বুট কাঁপিয়ে দিল ঘরখানা। প্রত্যেকের হাতে লম্বা টর্চ, দু জন উবু হয়ে বসে খাটের তলায় কি দেখলে। দু জন মা-মেয়েকে পাশ কাটিয়ে ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখলে। এক জন মিসেস্ চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করলে :

"ক্ষমা করবেন মিসেস্ চৌধুরী, সত্যিই অনর্থক আপনাদের বিরক্ত করলাম।"

এতক্ষণ যেন ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মিসেস্ চৌধুরীর, অজ্ঞানই বোধ হয় হয়ে পড়তেন। কোনও রকমে ধাক্কাটা সামলে ভয়ানক নার্ভাস সুরে বললেন :

"না না, বিরক্ত মোটে হই নি। কিন্তু ব্যাপারটা কি অফিসার? হয়েছে কি?"

অফিসার ততক্ষণে ইশারা করে ফেলেছেন অন্য সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। নিজেও পেছু হটতে শুরু করেছেন।

দরজার বাইরে এক পা দিয়ে ঘরের ভিতর মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ

"না না, তেমন কিছু নয়। একটা লোককে আমরা খুঁজছি। তাকে এধারে আসতে দেখা গেছে একটু আগে। এধারটায় তো শুধু আপনারই ভিলা, আপনারা একরকম একলাই থাকেন কিনা, তাই একটু সাবধান হওয়া গেল। লোকটা এ দিকটায় আসে নি জেনে আমরা একটু নিশ্চিন্ত রইলাম। এই আর কি—"

অনেকগুলো চকচকে দাঁত বার করলেন অফিসার।

নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী। ভয়ে একেবারে নীল হয়ে গেল তাঁর মুখখানি। ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"লোকটা কে অফিসার? খুনে-টুনে নাকি?"

"না না, সে সব কিছু নয়। দস্তুর মত এক জন ভদ্রলোক, গভর্নমেণ্টের খুব বড় অফিসার। সবাই জানে তাঁর নাম। মিস্টার খাঁ, পুরো নাম হল কুবলয় খাঁ। বড় পোস্ট হোল্ড করতেন। বড় রকম দাঁও মেরেছেন বোধ হয়। ভদ্রলোক বোকামি করছেন পালাবার চেষ্টা করে। আচ্ছা—চলি তা হলে। বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।"

দাঁতগুলো সুদ্ধ মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু একটু করে অনেকগুলো কোঁচ জেগে উঠল মিসেস্ চৌধুরীর কপালে গালে ঠোঁটে, পরিপাটি প্রসাধনেও সেগুলো আড়াল রইল না। মেয়ের মুখখানি দেখাই গেল না, চুলের তলায় ঢাকা রইল মুখখানি। মা-মেয়ে ছু জনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ না বুটের আওয়াজ বহু দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ এতটুকু নড়লেন না।

পালাচ্ছেন মিস্টার কুবলয় খাঁ। প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করছেন।

অনেকে তাও করছেন না। স্পষ্ট ভাষায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেদের সমস্ত কীর্তিকলাপের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাতেও রেহাই নেই। ফাঁসি দাও—এই প্রার্থনা জানিয়েও কয়েক জন নিস্তার পান নি নরকযন্ত্রণা ভোগ থেকে। গভর্নমেণ্ট আইন বানিয়েছেন, দেশের শত্রুকে বিচার করে কোনও শাস্তি না দিয়ে দেশের লোকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দেশসুদ্ধ মানুষ যা-খুশি করতে পারে তাকে নিয়ে, তাতে কারও কিছু বলবার নেই। ঘুষ নেওয়া, ঘুষ দেওয়া, ভেজাল মিশানো আর ধরাধরি করা, এই কাজগুলো হল দেশের সঙ্গে শত্রুতা করা। দেশের শত্রুদের জন্যে গভর্নমেণ্ট দায়ী হতে পারেন না। আইন বানাবার জন্যে আর আইনের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে যাঁদের নির্বাচিত করেছে দেশের মানুষ, তাঁরা দেশসুদ্ধ মানুষের দাবি উপেক্ষা করতে পারেন না।

কিন্তু দেশের মানুষের দাবি যদি পালটে যায়!

মিসেস্ চৌধুরী নিজের কপালের রঙের কথা ভুলে গিয়ে এক হাত তুলে রগড়াতে লাগলেন কপালটা। কপালের চামড়ার নীচে অসহ্য একটা জ্বালা অনুভব করলেন যেন। কি অসহায় অবস্থা। কারও কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করাও চলবে না। ধরাধরি করা হচ্ছে বলে তৎক্ষণাৎ বিচারের জন্যে পাঠাবে। কিন্তু দেশের মানুষেরা যদি হঠাৎ অন্য রকম দাবি করে বসে!

কপাল রগড়াতে রগড়াতে চোখের কোণ দিয়ে মেয়ের পানে তাকালেন তিনি কয়েক বার। তার পর নোটের তাড়াসুদ্ধ আর একখানা হাত কাপড়ের তলা থেকে বার করে বাড়িয়ে ধরলেন। চরম নির্লিপ্ত কণ্ঠে অতি ছোট্ট একটি কথা বার করলেন মুখ থেকে :

"ধর।"

মেয়ে নড়লও না, যে ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবেই রইল।

সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল মিসেস্ চৌধুরীর, কপাল রগড়ানো

থেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন :

"কি—ছুঁবি নি নাকি এই টাকা ?"

মুখ তুলল মেয়ে, সভয়ে এক বার তাকাল নোটের তাড়াটার দিকে, মায়ের মুখের দিকেও এক বার তাকাল। তার পর হঠাৎ লাগাল দৌড়। কেউ যেন তাড়া করেছে পেছনে, ধরতে পারলে ছিঁড়ে-কুটে খাবে। পালিয়ে গেল মেয়ে ঘর ছেড়ে। হতভম্ব মা নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন, বাড়ানো হাতখানা নামিয়ে নিতেও তাঁর খেয়াল হল না।

রাগে নয়, দুঃখে নয়, অপমানে—নির্জলা অপমানে দিশাহারা হয়ে পড়লেন মিসেস্ আতুরী চৌধুরী। পরাজয়ের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা। মেয়ের কাছে হার মানতে হল তাঁকে, মেয়ে ছুটে পালাল মায়ের সামনে থেকে।...কেন ?—ঐ পালানোর একটি মাত্র অর্থই খুঁজে পেলেন মা। অর্থটি জলের মত তরল একেবারে। টাকার ওপরেও মায়া নেই মেয়ের, মায়ের আছে। এ টাকা ছুঁতেও ঘেন্না হল মেয়ের, ঘেন্না হল মায়ের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতেও। তাই অমন ভাবে ছুটে পালাল।

ঘেন্না !

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নোটের তাড়াটা বিছানার ওপর মিসেস্ চৌধুরী। দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খালি হাতখানার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে দেখতে লাগলেন হাতের আঙ্গুলগুলো। দেখতে দেখতে মুখের চেহারা পালটাতে লাগল তাঁর। কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। ফিরলেন, পা টেনে টেনে গিয়ে দাঁড়ালেন আবার আয়নার সামনে। সভয়ে তাকিয়ে রইলেন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। অনেক রকম করে দেখলেন মুখখানা। গা থেকে আঁচল নামিয়ে

দিয়ে ঘুরে-ফিরে শরীরটাও দেখলেন। দেখতে দেখতে আবার পালটাতে লাগল তাঁর মুখের ভাব। মাংস জমে উঠেছে, ঘাড়ে গর্দানে গলায় কোমরের ওপর বগলের নীচে থল্থল্ করছে মাংস। অনাবশ্যক মাংসপিণ্ডগুলো মহামূল্য জামা ফুঁড়ে বেরোতে চাচ্ছে যেন। আর চেয়ে থাকতে পারলেন না তিনি আয়নার দিকে, ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লেন বিছানার ওপর। মুখ গুঁজে স্থির হয়ে পড়ে রইলেন। কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জার দিকেও খেয়াল রইল না।

দিন নেই, দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক আগে। দার্জিলিং পাহাড়ের মিসেস্ চৌধুরীকে উংকট রকম স্নেহ করে কোনও রাজা-বাহাতুর আর তাঁর হোটেলে নিয়ে সাত দিন আটকে রাখবেন না। বেঢপ-দর্শন মাংসের বোঝাকে স্নেহ করার জন্যে কারও মাথায় খুন চাপে না, এই সত্যটুকু মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেই বোধ হয় মিসেস্ চৌধুরী অমনভাবে নিজেকে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

শোনা যায়, এ তুনিয়ায় এমন মানুষও নাকি আছেন, যিনি এ-হেন আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন যে-আনন্দ কোন মতেই কখনও নিরানন্দে পরিণত হয় না। কিন্তু কখনও কি কেউ এমন তুঃখ পেয়েছে, যে তুঃখ থেকে মুক্তি কিছুতেই আর মিলল না তার! লোকে বলে, আনন্দ বা সুখ জিনিসটাই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু একথা কেউ কখনও বলে না যে তুঃখটা আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষীণজীবী। তুঃখ যেমন আছে, তেমনি তার সান্ত্বনাও আছে। তা যদি না থাকত, তা হলে হরদম মানুষ গলায় দড়ি দিত বা বিষ খেত। তুঃখের ঠিক পেছনেই সান্ত্বনা লুকিয়ে থাকে বলে আজও মানুষ কোনও রকমে টিকে আছে এই তুনিয়ায়। হয়তো একটু দেরি হয় সান্ত্বনার সাক্ষাৎ পেতে। সেইটুকু সময় একটু সহ্য করে থাকলেই হল। জননী প্রসব-বেদনার তুঃখ সহ্য করে সন্তানের

মুখ দেখে সান্ত্বনা পাবার আশায়। সন্তানের মুখদর্শনের সম্ভাবনা না থাকলে সব জননীই আত্মহত্যা করে প্রসব-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই খুঁজত।

মিসেস্ চৌধুরীর সেদিনের সেই সর্বস্ব খোয়া যাবার দুঃখটা হঠাৎ উধাও হয়ে উবে গেল সশরীরে সান্ত্বনার আবির্ভাবে। পুরনো দিন আর ফিরবে না, এই নির্মম সত্যটা মিথ্যেয় পরিণত হল জাদুমন্ত্র বলে। বলার মত করে কে ফিসফিসিয়ে বললে কানের কাছে—"থাক, আর কাঁদে না, ছিঃ, লক্ষ্মীটি—"

অসংলগ্ন কয়েকটি কথা, যার সঠিক অর্থ কি, তা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু ঐ কথাক'টি যে সুরে যে ভাবে বলা হল, তা বুঝতে নিরেট পাষাণেরও এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। আড়ষ্ট হয়ে রইলেন মিসেস্ চৌধুরী। মুখ তুলে তাকালেনও না। হয়তো তাঁর শোনার ভুল, হয়তো বা তিনি স্বপ্ন দেখছেন। দরকার কি স্বপ্নটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে। ফেলে-আসা দিন কি ফেরত এল আবার! ঐ জাতের ফিসফিসানি অনেক শুনেছেন মিসেস্ চৌধুরী, সে কিন্তু অনেকদিন আগে। কতদিন আগে তা মনে করতেও তাঁর হৃৎকম্প হয়। বহু কাল পরে বিস্মৃতপ্রায় অদ্ভুত এক অনুভূতিতে তাঁকে পেয়ে বসল লজ্জা আর ভয়। ভয়ে লজ্জায় সিঁটিয়ে উঠল তাঁর মন। এক ধ্যাবড়া মাংসপিণ্ড উবুড় হয়ে পড়ে থাকলে কি কদর্য দৃশ্য হয়ে ওঠে, তাও তাঁর খেয়াল হল না। আর এক বার ঐ রকম কিছু শোনার আশায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেমনভাবে ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁর আশা পূর্ণ হল। আর এক বার সেই সুর, সেই ভাষাই শুনতে পেলেন ঃ

"মুখ তুলবে না বকু? কতদিন পরে এলাম, মুখ তুলে তাকাবেও না?"

অভিমান! আব্দার! অনুশোচনা!

অথবা হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু ঐ বকু ডাকটি। কে—কে ঐ নাম ধরে ডাকত তাঁকে! এডোর থেকে এডোরী, তাই থেকে আত্নরী চৌধুরী হয়েছেন তিনি। দার্জিলিঙের সব চেয়ে নামজাদা হোটেলে কবে কোন্ রঙিন রাত্রে কোন্ রাজাবাহাত্বর বা নবাবজাদা তাঁকে এডোর করে এডোরেব্‌ল বলেছিল তাও সঠিক আজ মনে করা মুশকিল। কিন্তু বকুলকে কে বকু বলে ডাকত, তাও কি তিনি মনে করতে পারবেন না!

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মিসেস্ চৌধুরী। কোনও দিকে না তাকিয়ে বলে উঠলেন:

"নীলুদা—কখন—মানে—কৈ—"

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। খাটের ওধারে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হয়ে রইলেন একেবারে। যাকে দেখবার আশা করেছিলেন, তার বদলে যেন অন্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর খাটের পাশে। যাকে দেখছেন, তাঁকে দেখার আশা যেন তিনি স্বপ্নেও করেন নি। কাজেই তাঁর হাঁ বন্ধ হল না।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় হেসে ফেললেন। নিঃশব্দ হাসিতে তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর বার হল। গম্‌গম্ করে উঠল ঘরের ভেতরটা।

"কি হল? হাঁ করে রইলে যে? বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি—না? তা আর বুড়ো হব না, তিন কুড়ি পার হয়ে গেল যে। এখনও কি সেই আগের মত থাকব নাকি?"

শুনে নিজের বয়স ফিরে পেলেন মিসেস্ চৌধুরী। কাপড়-চোপড় সামলে নেমে দাঁড়ালেন খাট থেকে। মুখ নীচু করে বললেন:

"বসো, ঐ খাটেই বসো। একেবারে শোবার ঘরে যখন এসে পড়েছ—"

এবার হাহা শব্দে হেসে উঠলেন পণ্ডিতজী। বললেন ঃ

"ভয়ানক অসভ্যতা করে ফেলেছি—না ? কিন্তু সবটাই যে ঘটে গেল ঘটনাচক্রে। আমি কি কল্পনাও করতে পেরেছি যে এখানে এসে তোমার দেখা পাব ? আমার মেয়ে বললে, তার এক বন্ধু আছে দার্জিলিঙে। নাম শুনে আমিও চিনলাম। ভাস্বতীর নাচ আমিও দেখেছি অনেক বার। সত্যিই পায়ের কাজ শিখেছে বটে মেয়েটা। কিন্তু ও যে তোমার মেয়ে তা জানব কেমন করে! এখানে এসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল, কি যেন এক উদ্ভট নাম এই বাড়িটার, কি এক বেশরম ভিলা না কি, সেখানে থাকেন মিসেস্ চৌধুরী নামে এক মেমসাহেব। মেমসাহেবের মেয়ে হল ভাস্বতী। আজই জেদ্ ধরল আমার মেয়ে, বেশরম ভিলা খুঁজে বার করা যাক। এসে পৌঁছলাম। দেখা হল তোমার মেয়ের সঙ্গে। বললে—যান, মা ঐ ঘরে আছেন। ঢুকে পড়লাম ঘরে। মেমসাহেবের পিঠ ঘাড় চুল দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল। ওই রকম কোঁকড়ানো চুল যেন কোথায় দেখেছি! এধার-ওধার চাইতে চাইতে ঐ ছবিখানার দিকে নজর পড়ে গেল। তার পর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে মেমসাহেবের মান ভাঙালাম—"

শুনছিলেন শ্রীমতী চৌধুরী। হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে উঠলেন, অত্যন্ত মিষ্টি জাতের একটি কপট ধমকানি। হয়তো বহুকাল আগে ঐ জাতের ধমকানি দিয়েছেন তিনি অনেক বার। সুরটা ঠিকই এসে গেল। বলে উঠলেন ঃ

"থাম তো এখন। মেয়েরা রয়েছে না পাশের ঘরে! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে।"

থেমে গেলেন পণ্ডিতজী। থতমত খেয়ে থামলেন না, এমনিই মুখ বন্ধ করে ফেললেন। বাকি কথা তো চোখ দিয়েও বলা চলে। মিটিমিটি হাসি আর চোখের চাউনিতে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল। পণ্ডিতজী খাটের ধারে বসলেন জুত করে। বসে প্রথম

কথাতেই বুঝিয়ে দিলেন যে কাণ্ডজ্ঞান তাঁর একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। বললেন ঃ

"আগে মুখ চোখ ধুয়ে এস দিকিনি ভাল করে। রঙেতে কালিতে মিশে গিয়ে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কাঁদতে লজ্জা করে না এই বয়সে? মা-মেয়ের ঝগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই। আমাদের বাপ-বেটীর মধ্যেও ও রকম ঝগড়া কত হয়, তা বলে কি আমি কাঁদতে শুই, না মেয়ে অমন যোগিনী সেজে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। যত সব ছেলেমানুষি! ঠিক সময়ে ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছি, নয়তো মেয়ে হয়তো ঐ অবস্থায় বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এতক্ষণে কোন পাহাড়ের খাদে। আর এধারে মা উবুড় হয়ে খাটে শুয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফোলাতেন। যাও ডেকে দাও গে ওদের এখানে, আলাপ-সালাপ করি আমরা। সেই কবে এক বার ভাস্বতীকে দেখেছিলাম লক্ষ্ণৌতে। কি নাচই নেচেছিল—আহা! বড় বড় গুণীরা থ' হয়ে গিয়েছিলেন। তার পর আর নামই শোনা গেল না শিল্পীর! কি করে জানব যে মা মেয়েকে এই হিমালয়ের মাথায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। চিরকেলে একলাসেঁড়ে একরোখা শ্রীমতী বকুলসুন্দরীই যে ওর মা, তা জানব কেমন করে।"

শ্রীমতী বকুলসুন্দরী ততক্ষণে ষোল আনা সংবিৎ ফিরে পেয়েছেন। মিসেস্ আহুরী চৌধুরী, যাঁর 'অশরণ অলীক' হল নামকরা সংবিৎসম্পন্ন মানুষদের তীর্থক্ষেত্র, সংবিৎ হারিয়ে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারেন না। মাপা হাসি মাপা কথা, মাপজোক করা আদবকায়দা অনুশীলন করে ধাতস্থ করেছেন তিনি, তাই চট্ করে নিজেকে ধাতস্থ করে ফেলতে পারলেন। সাধা গলার পাকা সুর বার করলেন ঃ

"ইস্, কি বুড়োই হয়ে গেছ নীলুদা! চিনতেই পারি নি দেখে। বসো বসো, ওদের ডেকে দিচ্ছি। ও ভাস্বতী, ভাস্বতী—"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যথেষ্ট কলাকৌশল প্রয়োজন

ওভাবে নেহাৎ তরুণীর মত চঞ্চল পদে প্রস্থান করতে, ঐ ছিটির মাংসের বোঝা বহন করে। চেয়ে রইলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ, বোধ হয় সত্যিই ভাবতে লাগলেন বসে বসে যে, কতখানি বুড়ো তিনি হয়ে পড়েছেন।

ঘরে ঢুকল হিয়া তার বন্ধু ভাস্বতীকে জড়িয়ে ধরে। ঢুকে বন্ধুকে এ-পাশের খাটের কোণে বসিয়ে দিলে। ত্রস্ত পদে বাপের কাছে গিয়ে কানে কানে কি সব বলতে লাগল। মুখের চেহারা পালটে গেল পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বাঁড়ুজ্যের। মেয়ের কথা শেষ হবার আগেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ভাস্বতীর দিকে। তার পর একান্ত অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। অনেক দ্বিধা সংকোচের বেড়া টপকে শুধু দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে বার হল ঃ

"আহা মা—"

অনেক সম্পদ লুকিয়ে ছিল ঐ ছোট্ট শব্দ দুটির মধ্যে। মুখ তুলে তাকাল ভাস্বতী পণ্ডিতজীর মুখপানে। পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে ফেললে। বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে নির্জীব হয়ে বসে রইল।

পণ্ডিতজী একখানি হাত তুলে রাখলেন তার মাথার ওপর, রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে লাগলেন। নিরুপায়, নির্জলা নিরুপায় তিনি, কিছুতেই এক ফোঁটা দুঃখ চুরি করতে পারবেন না মেয়েটার বুক থেকে। কালো হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর চোখ-মুখ, অন্ধ আক্রোশের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর সদানন্দ মূর্তিখানি। ক্রমেই যেন তিনি দূরে সরে যেতে লাগলেন। নীলকণ্ঠ পণ্ডিতের সাকার রূপ সেখানেই খাড়া রইল, আসল মানুষটি অনেক দূরে পালিয়ে গেল। বহু দূর থেকে বলতে লাগলেন ঃ

"সাহিত্য গেল, সঙ্গীত গেল, সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম সব গেল। মানুষ আর মানুষ রইল না। যুগযুগান্তের সাধনায় পশুত্ব থেকে

মুক্তি পেলে মানুষ, সেই মানুষই আবার পশুত্বের কাছে পরাজয় মানলে। দুর্নীতির গ্রাস থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সমস্ত জাতটাই দুর্নীতির জঠরে আশ্রয় নিলে। শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যে জঘন্য শত্রুকে আদর করে আমন্ত্রণ জানালে। সমস্ত জাতটাকে রক্তলোলুপ করে ছেড়ে দিলে। কোথায় নেমেছি আমরা, কি এর পরিণাম?”

ভাস্বতী মুখ তুলল। হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল:

“কিসের পরিণাম?”

চমকে উঠলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ, তাকালেন মেয়েটার দিকে। মাথার চুলে হাত চালানো বন্ধ হল, হাতখানা নামিয়ে নিলেন। আত্মস্থ হয়ে বকছিলেন, এবার সম্পূর্ণ সজাগ হলেন। বললেন:

“এই হিংসার। বহুকাল ধরে বহু আইনকানুনের বাঁধ দিয়ে যে প্রবৃত্তিটাকে মানুষ নির্জীব অসাড় করে ফেলেছিল, সেই প্রবৃত্তিটাকে আবার জাগিয়ে তোলার পরিণাম যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে—”

“পৌঁছে দেবে আমাদের এমন জায়গায়, যেখানে লোভ নেই। যেখানে অর্থোপার্জনের জন্যে লোকে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে ঠকায় না।”

খুব ধীরে ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে কথা ক'টি বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্বতী। পণ্ডিতজীর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে:

“আপনি পারবেন না সহ্য করতে সে সব। ঠকাতে ঠকাতে মানুষ কোথায় যে নেমে যায়, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। বাপ মা বউ, কেউ আর তখন তার আপনজন থাকে না। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। নির্বিচারে সকলকে ঠকিয়ে সে তখন ঠকানোর আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। সেই প্রবঞ্চনা আপনি সহ্য করতে পারবেন না।”

এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন পণ্ডিতজী। একটু যেন দমে গেলেন তিনি। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন:

“কিন্তু মা, প্রবঞ্চনা আছে বলেই কি আমরা আরও প্রবঞ্চিত হব? প্রবঞ্চকদের উচ্ছন্নে দেবার জন্যে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিলে যে

আত্মপ্রবঞ্চনার আর কিছু বাকি থাকবে না। প্রবঞ্চকরা যে এবার আমাদের মনুষ্যত্ব পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাদের উদ্দেশ্য যে ষোল আনা পূর্ণ হতে চলেছে!···কি সম্পদ আজ খোয়াতে বসেছি আমরা প্রবঞ্চকদের পাল্লায় পড়ে? তাদেরই যে জিত হয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত।"

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল হিয়া, নিস্পৃহ ভাবে শুনছিল সব। এবার বলে উঠল ঃ

"কুকুরে মানুষ কামড়ায় বলে মানুষরাও কুকুর হয়ে গিয়ে কুকুর কামড়াবে—বাঃ!"

ভাস্বতী ফিরে দাঁড়াল। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

"না, কুকুরগুলোকে শুধু ঢিল মেরে মেরে—মেরে ফেলবে।"

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে হিয়া ঃ

"তা কেন? কুকুরগুলোকে পোষ মানাবে। যা চিরকাল মানুষ করে এসেছে, তাই করবে। পোষ মানিয়ে কুকুরের কামড়ানো স্বভাব পালটে দেবে।"

এতক্ষণ পরে একটু হাসি দেখা দিল ভাস্বতীর মুখে, বড় করুণ বড় অসহায় সে হাসির ধরন। বললে ঃ

"হবে না ভাই, কিছুতেই তা হবার নয়। সর্বস্ব খুইয়েছি আমি, পোষ মানাবার জন্যে করতে আর কিছু বাকি রাখি নি। কিন্তু পারলাম না তার বিশ্বাস অর্জন করতে। নিজেকে বলি দিয়েও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি। সে খিদে যে কি ভয়ানক খিদে, নিজেকে খেয়ে তবে তার খিদে মিটল।"

এগিয়ে এল হিয়া, বন্ধুর কাঁধের ওপর হাত রেখে প্রায় চুপিচুপি বললে ঃ

"এত সহজে হার মানতে হবে? কিছুতেই নয়। এ আমি কিছুতেই মানব না। কোনও ক্ষমতা নেই আমাদের? কিছুই আমরা করতে পারব না?"

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বাঁড়ুজ্যে বিড়বিড় করে বললেন ঃ

"যাক, সব উচ্ছন্নে যাক্। যেতেই যখন বসেছে সব, তখন যত তাড়াতাড়ি একদম শেষ হয়ে যায় ততই ভাল।"

"কি বললেন!"

আচম্বিতে যেন ঘুম ভাঙল ভাস্বতীর। পণ্ডিতজীর দিকে চোখ তুলে আর এক বার জিজ্ঞাসা করল ঃ

"কি বললেন?"

জবাব দেবার জন্যে হাঁ করলেন পণ্ডিতজী। হাঁ হাঁ-ই হয়ে রইল। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন মিসেস্ চৌধুরী। রুদ্ধনিশ্বাসে বলে গেলেন ঃ

"সব শেষ হয়ে গেল। কুবলয় খাঁ লড়েছে, একলা লড়েছে সেই কুকুরদের সঙ্গে। যতক্ষণ গুলি ছিল, লড়েছে। কুকুরের পাল তাড়া করেছিল তাকে। গাড়ি নিয়ে সে পালাচ্ছিল। বাতাসিয়া লুপের কাছে গাড়ি বন্ধ করে গুলি চালিয়েছে। তার পর বাতাসিয়া লুপ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে গাড়িসুদ্ধ খাদের মধ্যে। ওরা তাকে ছুঁতে পারে নি। ওরা আর কুবলয় খাঁকে বেইজ্জত করতে পারবে না।···হা হা হা হা।"

বদ্ধ উন্মাদের মত হাসি জুড়ে দিলেন।

সেই হাসির মধ্যেই চীৎকার করে উঠল ভাস্বতী ঃ

"পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়ে গেছি।"

চমকে উঠলেন পণ্ডিতজী, সভয়ে ফিরে দাঁড়াল হিয়া বন্ধুর দিকে। দেখল, অদ্ভুত জাতের এক খুশির আলো জ্বলে উঠেছে বন্ধুর চোখে মুখে। ওপর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে অদৃশ্য জগতে কত কি যেন সে পড়বার চেষ্টা করছে। দু হাতে জাপটে ধরল হিয়া বন্ধুকে, সজোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললে

"কি পেয়েছিস? কি দেখছিস অমন করে?"

সেই ভাবে ওপর দিকে তাকিয়েই বলতে লাগল ভাস্বতী :

"বেইজ্জত করতে পারবে না। কিছুতেই নয়। ইজ্জত বাঁচবেই এবার!"

চোখ নামিয়ে তাকাল বন্ধুর মুখের দিকে ভাস্বতী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল হিয়ার মুখখানি। ডান হাত তুলে হিয়ার গলাটা আলতোভাবে ছুঁয়ে দেখলে। শেষে খুব গোপনীয় পরামর্শ করার মত করে বলতে লাগল :

"তোর ঐ গলা আর আমার এই পা দুখানা—শুধু পা কেন—এই শরীরটাই সব এবার কাজে লাগবে। ইজ্জত বাঁচাবার কাজে লাগবে এবার তোর আমার সাধনা—",

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হিয়া বলে উঠল :

"তাই তো এতক্ষণ বলছি ভাই, এত সহজে আমরা হার মানব কেন?"

"না না না, কিছুতেই নয়। আর হার মানামানি নেই। জিত, শুধুই জিত এবার থেকে।"

বলতে বলতে বন্ধুর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে ছুটে গেল ভাস্বতী বিছানার কাছে। নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে ফিরে এল পণ্ডিতজীর সামনে। পণ্ডিতজীর একখানা হাত ধরে নোটগুলো জোর করে সেই হাতে ধরিয়ে দিল। বলতে লাগল :

"ধরুন ধরুন, ধরুন এগুলো শিগ্‌গির। এখুনিই ব্যবস্থা করুন জলসার। আমার নাচ, হিয়ার গান আর আপনার পরিচালনা। নেমন্তন্ন করুন গণ্যমান্য সকলকে। আমি আর হিয়া, আমরা দু জনেই সব জিতে নেবো। হার আমরা আর কিছুতেই মানব না।"

বিভ্রান্ত পণ্ডিতজী কি বলবেন, কি করবেন বুঝতেই পারলেন না। নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

জেগে উঠেছে ভাস্বতীর চরণ ছুখানি। এক রকম নাচতে নাচতেই সে বেরিয়ে গেল হিয়াকে জড়িয়ে ধরে। শুনিয়ে গেল তার শেষ কথা ঃ

"পেয়েছি। নিশ্চয়ই পেয়েছি। মিস্টার খাঁ পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। কিছুতেই আর আমরা হার মানব না।"

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ছুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁদের যে ছোটার ক্ষমতা ফুরিয়েছে।

দার্জিলিং।

সাজানো শহর দার্জিলিং। থাকে থাকে সাজানো শহর, একতলা থেকে পাঁচতলা। সর্বনিম্নতলায় শ্মশান, সর্বোচ্চতলায় বিদ্যাদায়িনী বাগীশ্বরী দেবীর মহাপীঠ। পূব দুনিয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকে ছাত্র আসে সেই মহাপীঠে। শিক্ষক অধ্যাপক শিক্ষিকা অধ্যাপিকারা এক রকমের সংসারত্যাগী মানুষ। বিদ্যার সাধনা করতে হলে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া চলে না। অন্ততঃ আধাআধি রকম সরে থাকতে হয় দুনিয়ার কলহ কচকচি থেকে। এই জন্যেই দার্জিলিং শহরের সর্বোচ্চতলায় বাগীশ্বরী মহাপীঠ স্থাপনা করা হয়েছে। সেখানে নিরিবিলিতে মনুষ্যশাবকদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার সাধনা চলে।

তার পরের তলায় তফাতে তফাতে ডেরা গেড়েছেন তাঁরা, যাঁরা তফাতে থাকাই পছন্দ করেন। যাঁরা ভোগ-বিলাসের সাধনা করেন, যাঁরা সেই সাধনা করার সামর্থ্য রাখেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের জীবন যাপন-প্রণালী লুকিয়ে না রাখলে যাঁরা লোকের সামনে মুখ দেখাতেও পারেন না। এঁদের পূর্বপুরুষরা গড়েছিলেন দার্জিলিং। ভারতবর্ষের বুকে স্কটল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা, সেই স্বপ্নকে প্রাণপণে জীবন্ত করে রেখে গেছেন। এঁদের তৈরী ক্যাস্‌ল্‌, ভিলা, কটেজ সবই ও-দেশের ধাঁচে গড়া, সাজানোও বিশুদ্ধ ওদেশীয় শাস্ত্রানুযায়ী। রহস্যময় নির্জন স্থানে মায়াময় পুরী-গুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দামী দামী কুকুর ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর বড় একটা সাক্ষাৎ মেলে না।

তার পর তৃতীয় তলা। এই তলাটাই সব থেকে জীবন্ত তলা

দার্জিলিঙের। বড় বড় পান্থশালা, মহামূল্য বিলাসোপকরণে সাজানো ভোজনাগার, দার্জিলিঙের ফ্যাশান শো'র স্থান ম্যাল—সবই এই তলায়। দার্জিলিং গেলে অতি আকখুটে অঘা থেকে শুরু করে মহাভাগ্যবান ভাগ্যবতী পর্যন্ত প্রত্যেকেরই দৈনিক এক-বার নিজেদের সাজ-পোশাক দেখাবার জন্যে এই তলাটায় একটা চক্কর দেওয়া চাই। এইখানেই ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ট্যাক্সিওয়ালা রিক্‌শওয়ালা আরও কত রকমের ওয়ালা কত জাতের সওদা নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকে, কে তার হিসেব রাখে।এখানে চোখের ভাষায় দরদস্তুর হয়, কেনা-বেচার মাল অনেক সময় নজরের আড়ালে থাকে। জহুরী খদ্দের জহর বিক্রেতাকে ঠিক চিনে নেন। মাল পয়মাল সব এখানে কিনতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় তলার নীচের তলাটার নাম কার্ট রোড, যেখানে হল দার্জিলিং স্টেশন। আইন-আদালত বাজার আড়ত সব হল এই তলায়। এইখান থেকে আসল দার্জিলিঙের শুরু। কেরানী, কুলী, কয়লার দোকান, কাঁচা আনাজ সবই এখানে মেলে। এর নীচের তলাগুলোর বিবরণ দেওয়া না দেওয়া সমান। সে সমস্ত স্থানে যারা মাথা গুঁজে থাকে, তারা হল ওপরতলার খিদ্‌মদগারের জাত। ওপরতলার সাহেব মেমসাহেবরা এদের কাছ থেকে সেলাম গ্রহণ করেন, হুকুম দান করেন এবং এদের সেবার তারিফ করেন। দার্জিলিঙের দার্জিলিঙত্ব বজায় রাখার জন্যে এরা হাসপাতাল চালায়, রাস্তা-ঘাট সাফ রাখে, আলো জ্বালায়, জল দেয়, আর ফুল ফোটায়। তার পর সব কাজ শেষ হলে সর্বনিম্নতলায় শ্মশানে নেমে যায় চুপিচুপি। কখন যায়, কি ভাবে যায়, সে সব ছোট সংবাদ রাখার মত ছোট নজর দার্জিলিঙে কারও নেই।

শ্রীগুলাব প্রধানের আস্তানাটি হল কার্ট রোডের নীচের তলায়। কাছারি ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে নামবার একটা

সরু পথ আছে। পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে প্রধান পাড়ায়। প্রধান পাড়ার শেষ প্রান্তে গুলাব প্রধানের বাড়ি। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে টিন কাঠ দিয়ে বানানো এক খাঁচা। কোনও কালে হয়তো বাড়িটার শ্রী ছিল, রঙ ছিল, জেল্লা ছিল। সবই গেছে। পোড়ো বাড়িটা দার্জিলিঙের ধেড়ে ইঁতুরদের হেপাজতে থাকে বছরের তিন শ তেইশ দিন। অবরে-সবরে প্রধানজী যখন আসেন দার্জিলিঙে, তখন একখানা ঘর খুলে কোনও রকমে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার সরে পড়েন। কাজেই পোড়ো বাড়ির যা দশা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। ইলেকট্রিকের তার নষ্ট হয়ে গেছে, আলো জ্বলে না। কলের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, জল পড়ে না। জানালা-দরজার কাঁচ ভেঙে গেছে, জল বাতাস মেঘ কুয়াসা আটকায় না। ঘরে ঘরে ছোবড়ার কাঁড়ি জমে গেছে, খাটের ওপরে গদিতে কিছুই নেই। ইঁতুর-বংশ তাদের দাঁতের কসরত চালিয়েছে সমস্ত আসবাবপত্রের ওপর। আস্ত বলতে কোনও ঘরে একটি জিনিসও নেই।

নির্বিকার প্রধানজী সেই আস্তানাতেই নিয়ে গিয়ে তুললেন সপারিষদ রুদ্রমশাইকে। তৎক্ষণাৎ লোকজন জড়ো করে চতুর্দিক সাফসুথরা করতে লাগিয়ে দিলেন। বাড়ির ভেতরের তু-তিনখানা ঘরকে যতটা সম্ভব ভদ্র করে তোলা হল।

ফ্যাসাদ বাধল রুদ্রমশাইকে নিয়ে। প্রধানজীর বাসায় পদার্পণ করেই তিনি একা একা সব ক'টা ঘর ঘুরে দেখলেন। উত্তর-পশ্চিম কোণার ঘরটায় ঢুকে আর বেরোতে চাইলেন না। ডাঁই প্রমাণ আবর্জনার মধ্যে নিজের বিছানাটা আনবার আদেশ দিলেন। ঘরটায় একখানা মাত্র চৌকি ছিল। চৌকির ওপর যে গদিখানা ছিল, তার ছোবড়ায় সমস্ত ঘরটা নরক-তুল্য হয়ে উঠেছিল। গদির অবশিষ্ট যেটুকু তখনও পড়ে ছিল চৌকির উপর, স্বহস্তে সেটা টেনে ফেলে দিলেন মেঝেয় রুদ্রমশাই। দিয়ে নিজের বিছানা

পেতে শয্যাসীন হলেন। তার পর চড়া গলায় কড়া হুকুম জারি করলেন, কোনও মতেই সে ঘরের এতটুকু আবর্জনা বার করা চলবে না।

চলবে না তো চললও না। সে সময় আর কারও সাহস হল না রুদ্রমশাইকে ঘাঁটাতে। দরকার কি, রুদ্রজী যখন বেরোবেন ঘর ছেড়ে, সেই ফাঁকে সব সরিয়ে ফেললেই হবে। এই মতলব করে প্রধানজী তাঁর অন্য সব অতিথিদের জন্যে যত দূর সম্ভব সুখসুবিধের ব্যবস্থা করে দিলেন। বেচারী ইন্দুমতী, সে রাতটা তাঁর একখানা চেয়ারের ওপর বসে কেটে গেল। নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন রুদ্রমশাই সারারাত, পাশে একখানা চেয়ারের ওপর বসে ইন্দুমতী ঢুলতে লাগলেন। কোনও আক্ষেপ কোনও দুঃখ আর নেই তাঁর। বাকি জীবনটার সব কটা রাতই যদি জঞ্জালের মধ্যে চেয়ারে বসে ঢুলতে হয়, তাতেও তাঁর শান্তি। শেষ পর্যন্ত মুক্তি তো পেয়েছেন তিনি সহৃদয় পাড়াপড়শী চেনা-জানা মানুষদের খপ্পর থেকে। কোন্ বারে, কি তিথিতে, কত দক্ষিণা দিলে কোথায় গিয়ে পাগল সারাবার অব্যর্থ তাবিজ তাগা মিলবে, এই উপদেশামৃত শুনতে শুনতে তাঁর কান পচে গেছে। মুখ টিপে সহ্য করতে হয়েছে সহৃদয়তার অত্যাচার। কত পাপ করলে স্বামী পাগল হয়, একমাত্র সন্তান পালিয়ে যায়, তাও শুনতে হয়েছে। এত দিনে রেহাই মিলল তাঁর কপালে, নেহাতই বরাত জোরে ঘটে গেছে এই রেহাই পাওয়াটা। কস্মিন-কালেও শোনেন নি তিনি গুলাব প্রধান নামটি স্বামীর মুখে। এমন যে এক জন নেপালী বন্ধু আছে স্বামীর, এ কথা কি ঘুণাক্ষরেও জানতেন! হঠাৎ ঠিক সময় আবির্ভাব ঘটল প্রধানজীর। গুলাব প্রধান তাঁকে রক্ষা করলেন, নয়তো তিনিই বোধ হয় সত্যিকারের পাগল হয়ে যেতেন। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর ছিটটুকু আর থাকবে না। তখন অন্য কোথাও ভাল বাড়ি একটা দেখে নিলেই চলবে।

ভাল বাড়ি বা ভাল হোটেল, একটা উপযুক্ত স্থান আর একটু উপযুক্ত পরিবেশ, খুঁজে বার করতে হবে পণ্ডিত নীলকণ্ঠকেও। কেন ওঁরা বিনা পয়সায় থাকবেন গুলাব প্রধানের আশ্রয়ে? সামর্থ্য আছে, নাম আছে। তা ছাড়া খুবই নামকরা বন্ধু আছে হিয়ার দার্জিলিঙে। ভাস্বতীকে নিশ্চয়ই সবাই চিনবে। কোথায় সে আছে বলেও দিতে পারবে। সেই খোঁজেই বেরোলেন ওঁরা পিতা-পুত্রী পরদিন সকালেই। শান্তনু রুদ্রকে মাঝে মাঝে এসে গান শোনাবেন যেমন শোনাতেন আগে। আপদে-বিপদে দুই বন্ধু দু জনের সহায়, তা বলে একই বাড়িতে একসঙ্গে থাকাটা কি পোষায়, না ভাল দেখায়!···কল্যাণের অত ভাল-দেখানোর বালাই নেই। প্রথমেই সে আসতে চাইছিল না দার্জিলিঙে, একরকম জোর জবরদস্তি করে এনেছেন ইন্দুমতী। এসেই সে তার সোজা আর সংক্ষিপ্ত মতটা জানিয়ে দিয়েছে প্রধানজীকে। বাড়ি সারাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বলে দিয়েছে:

"কেন খামকা দাবড়ে বেড়াচ্ছ নেপালী-দা গোবদা গোবদা বুট বয়ে? এই স্বর্গে ক'দিন তিষ্ঠোতে পারবেন এঁরা? ঝড় জল কুয়াসা, আবার শুনছি নাকি শিগ্‌গির বরফও পড়বে। সময় থাকতে বেশী করে খানকতক কাঁথা কম্বল আর খানিক আগুনের যোগাড় দেখ। কেন মাথা ঘামাচ্ছ ইলেকট্রিকের তার আর জানালার কাঁচ নিয়ে? যেমন আছে সব তেমনি থাকুক, দু-চার দশ দিন পরে বাপ্ বাপ্ বলে সবাই পিট্‌টান দেবেন। বাপস্, পেটের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি-গুলো পর্যন্ত জমে মোষের সিং হয়ে গেল শীতের গুঁতোয়। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে মৌরুসী পাট্টা গেড়ে বসে থাকবে এই হিমালয়ের মাথায়।"

যে যার নিজের মত-মতলব মত ব্যবস্থা করে নিলে। ইন্দুমতীর তো আর মত-মতলব বলে কিছু থাকতে নেই। স্বামীর মত-ই তাঁর মত। তাই তিনি দার্জিলিঙের মত স্থানেও সাতসকালে স্নান সেরে

একেবারে তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকলেন। রুদ্রমশাইকে তুলতে হবে, ঘর-দরজা পরিষ্কার করাতে হবে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে তিনি পুরনো কথা একেবারে ভুলে যান। নতুন জায়গায় নতুন আবহাওয়ায় নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে, যদি অবশ্য ইন্দুমতী নিজেকে ঠিকমত তৈরী করতে পারেন। চোখ মুখ সর্ব অবয়ব থেকে বিষাদের ছায়া যত্ন করে ধুয়ে মুছে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ঘরে ঢুকলেন ইন্দুমতী। ঢুকে আগে একটা জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়ল। তাতে বিশ্রী নোংরা অবস্থাটা আরও বিশ্রী ভাবে দাঁত বার করে ফেললে। ইন্দুমতীর চোখে কিছুই বিশ্রী লাগল না। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে দেখতে গেলেন তিনি—রুদ্রমশায়ের ঘুম ভাঙল কি না।

চোখ মেললেন রুদ্রমশাই। সঙ্গে সঙ্গে এক হাত তুলে ঢেকে ফেললেন মুখের আধখানা। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ

"বন্ধ কর, বন্ধ কর, টেনে দাও জানালার পর্দা। খবরদার এক ফোঁটা আলো যেন না ঢুকতে পারে এই ঘরে।"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইন্দুমতী এই নতুন আবদারটি শুনে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"বাঃ, এ আবার কেমন কথা! দিন রাত ঘরখানা অন্ধকার হয়ে থাকবে!"

"নিশ্চয়ই থাকবে। আলোর আবার দরকার কি? রাত বেঁধে রাখব এই ঘরে, নিস্তব্ধ রাত, নিঝুম রাত, আলকাতরার মত নিবিড় আঁধার রাত।···দিন ফুরিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। এখন রাত, শুধু রাত। কবরের ভেতর যেমন নিরবচ্ছিন্ন রাত, তেমনি রাত থাকবে এই ঘরে। মরে লোকে কবরে যায় নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি ভোগ করার জন্যে। বেঁচে থেকে তাই ভোগ করব আমি। এ কি কম কথা নাকি? এ সুযোগ ক'জনার বরাতে ঘটে?"

খুবই স্ফূর্তির সঙ্গে ফিসফিস করে বললেন কথাগুলো রুদ্রমশাই,

যেন খুবই মজার কথা বললেন। মজাই পেলেন ইন্দুমতী এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে। ছেলেমানুষী দুষ্টুমি বুদ্ধি শুনলে যেমন ভাবে হেসে ওঠে মানুষে, তেমনি ভাবে হেসে ফেললেন। ছেলেমানুষের ওপর যেমন কপট রাগ করে ধমকায়, তেমনি করে ধমকে উঠলেন:

"খুব হয়েছে কাব্য করা। এখন ওঠ তো লেপ ছেড়ে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হোয়ে নাও। হিয়া আর তার বাবা কখন বেরিয়ে গেছে বেড়াতে। আমরাও বেড়াতে যাব। কত দিন দু জনে এক সঙ্গে বেড়াই নি! এখানেও কি ঘরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে এসেছি নাকি?"

"কি বললে!"

যা শুনলেন তা যেন ভুল শুনলেন রুদ্রমশাই। আরও ভাল করে শোনার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন বিছানার ওপর। উত্তেজিত ভাবে বললেন:

"এঁ্যা, কি বললে! আমরা বেড়াতে বেরোব! এই মুখ আমরা দেখিয়ে বেড়াব লোককে!...আঁতকে উঠবে না লোকে?...ছুটে পালাবে না আমাদের মুখ দেখলে?"

গায়ে মাখলেন না ইন্দুমতী স্বামীর উদ্ভট কথাগুলো। আগের ভাবটুকু বজায় রেখে অত্যন্ত হালকা সুরে বললেন:

"যার খুশি আঁতকে উঠুক, যার ভূত চাপবে কাঁধে সে ছুটে পালাক। তাতে আমাদের কি? ওঠ লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। রোদ উঠেছে, কি চমৎকার দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। চল, লেবংএর ওধার থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে আসি।"

"কাঞ্চনজঙ্ঘা! ও, কাঞ্চনজঙ্ঘা। তা বেশ তো—"

বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে নেমে পড়লেন রুদ্রমশাই খাট থেকে। নেমেই তাঁর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন:

"কিন্তু, কিন্তু ইন্দু, ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যদি সব বলে দেয়! যদি

ওই বরফের চূড়ায় একে একে সব কথা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে! মানে, সব রঙই বড্ড স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে কি না কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ-মাখানো গায়ে—”

এবারও ইন্দুমতী অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলেন স্বামীর ভয় দেখানো। বললেন ঃ

“যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড। সকাল বেলাই আরম্ভ হল কথার মারপ্যাঁচের খেল। চল, চল, জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ওধারে। রাস্তায় বেরিয়ে যত-খুশি আবোল-তাবোল বোকো। আগে রাস্তায় তো বেরিয়ে পড়ি আমরা, তার পর দেখা যাবে।”

তাড়ার চোটে এগিয়ে চললেন রুদ্রমশাই দরজার দিকে। যেতে যেতে বললেন ঃ

“রাস্তায় রাস্তায় আবার ঘুরতে হবে! কেন! রাস্তায় বেড়াব কেন? বেশ ঠাণ্ডা জায়গা, লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি না কেন তার চেয়ে। কেউ দেখতে পাবে না। খামকা আবার লোকের সামনে ঘুরে বেড়ানো কেন? এই জঞ্জাল, এই অন্ধকার,—এই কবর, এই-ই তো বেশ।”

কথার পিঠে কথা এসেই পড়ে। স্বামীর পেছনে চলতে চলতে ইন্দুমতী বললেন ঃ

“বেশ তো, এ বাড়ি এ ঘর ভাল না লাগে, অন্য বাড়ি খুঁজে নিলেই হবে। হিয়া আর বাঁড়ুজ্যেমশাই তো বাড়ি খুঁজতেই বেরিয়েছেন। চল না, আমরাও একটা ভাল জায়গা খুঁজে নিই।”

ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই। সভয়ে বলে উঠলেন ঃ

“না না, অমন কথা মুখেও এনো না ইন্দু। ওরা যাক্, অন্য জায়গা খুঁজে নিক। ওরা মানী লোক, কেন ওরা থাকবে গুলাবের আশ্রয়ে। নাম-করা জায়গায় গিয়ে থাকুক ওরা। আমরা এইখানেই থাকব। লুকিয়ে থাকব। পেঁচার মত থাকব আমরা।

কেউ জানবে না, কোথায় গেল শান্তনু রুদ্র। কিছুদিন পরে সবাই ভুলে যাবে শান্তনু রুদ্রের নাম। বেশ হবে, চমৎকার হবে।"

"কেন? কার কি করেছি আমরা যে লুকিয়ে থাকতে যাব?"

ঝংকার দিয়ে উঠলেন ইন্দুমতী।

"চুরি করেছি না খুন করেছি যে পালিয়ে বেড়াতে হবে? যত সব—"

"করি নি? কিছুই করি নি আমরা?"

এক পা সরে এসে স্ত্রীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই। অন্য কেউ যেন না শুনে ফেলে, এই ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলেন :

"কিছুই করি নি আমরা? তা হলে এ সমস্ত ঘটছে কেন? এই যে সব মরছে, দল বেঁধে মানুষে মানুষ মারছে টিলিয়ে, এ সমস্ত কেন ঘটছে? দোষী তার সমস্ত দোষ কবুল করছে। কবুল করার ফলে কি ভাবে তাকে মরতে হবে, তা জেনেও কিছু লুকোচ্ছে না। কেন? আর—"

থামলেন রুদ্রমশাই। একটা ঢোক গিলে আরও চাপা গলায় বললেন :

"আর—সেই বৈজ্ঞানিক, যাকে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে গভর্নমেণ্ট যে বাপ-মা পর্যন্ত তার কোনও সংবাদ পাবে না, সেই বৈজ্ঞানিক নাকি লোকের মনের ছবি তোলবার কল বার করেছে! কোথায় সে পেল সেই কলটা?"

"কল বার করেছে না হাতি। কেন ও সমস্ত বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? ও সমস্ত কিছুই নয়। পুলিসের চাপে পড়ে সবাই সব স্বীকার করে ফেলছে। কত কাল আর চলতে পারে এ ভাবে? ভগবান কি নেই নাকি? দেশসুদ্ধ মানুষ ঘুষ দিতে দিতে আর ভেজাল খেতে খেতে ম'ল। চোর, সব জায়গায় চোর কিলবিল করছে। আপিসে চোর, আদালতে চোর, মিল ফ্যাক্টরি—সর্বত্র চোর। কে কার গলায় পোঁচ দেবে, এই আশায় ছুরি শানিয়ে বসে

আছে। এ ভাবে কত দিন চলতে পারে? কত দিন আর চুপ করে সহ্য করবেন ভগবান? তিনিই এ সমস্ত করাচ্ছেন। দেশের মানুষ এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। দ্বাপরের কংসের অত্যাচার চলছে এই কলিতে। অত্যাচারী এবার ষোল দুগুণে বত্রিশ আনা ফল ভোগ করবে। এ সমস্তই সেই তাঁর ইচ্ছা।”

ভগবানকে সব ব্যাপারের জন্যে দায়ী করে ইন্দুমতী চুপ করলেন। কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছেন ভেবে বেশ একটু শান্তিও পেলেন। ভগবানের দোহাই দেওয়ার ফল কতটুকু ফলল স্বামীর ওপর তা বোঝবার জন্যে আড় চোখে তাকালেন এক বার স্বামীর মুখের দিকে। তাকিয়ে কিন্তু আরও ঘাবড়ে গেলেন। রুদ্রমশাই খুবই ভয় পেয়েছেন যেন, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছেন তিনি।

বহু দূরে কোথায় দৃষ্টি চলে গেছে তাঁর। ঠোঁট নড়ছে, কি যেন বলবার চেষ্টা করছেন। কথাগুলো স্পষ্ট বেরোচ্ছে না মুখ থেকে।

ভয় পেয়ে গেলেন ইন্দুমতীও। স্বামীকে ধরে একটা ঝাঁকানি দিলেন। আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন:

“কি হল? অমন করছ কেন—”

রা ফুটল রুদ্রমশায়ের মুখে। থেমে থেমে বলতে লাগলেন:

“ভগবান! ভগবান এই সমস্ত করাচ্ছেন! ভগবানও তা হলে মাথা ঘামানো শুরু করেছেন মানুষদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে। তিনিই বিচার করছেন, তিনিই রায় দিচ্ছেন, তিনিই সব কিছু কবুল করাচ্ছেন। খুব ভাল যুক্তি, চমৎকার মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সাজাটাও ভগবান নিজে হাতে দিন না, সেটা দেবার জন্যে আবার মানুষের ওপরে ভার দিচ্ছেন কেন? মহাভারতে আছে, অধর্মের অভ্যুত্থান হলে ভগবান আবির্ভূত হয়ে পাপীদের নাশ করেন। ঐ মহাভারতেই রয়েছে, পাপীদের নাশ করার জন্যে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করতে হয়েছিল ভগবানকে। মানুষের পেছনে মানুষ

লেলিয়ে দিতে হয়েছিল।···কেন? নিধনকর্মটি স্বহস্তে সম্পাদন করে কৃপাময় ভগবান আরও একটু কৃপা প্রদর্শন করলেন না কেন? মানুষকে দিয়ে মানুষ শিকার করিয়ে বড় মজা পান তিনি! কিংবা আর একটা কাজও তো ভগবান করতে পারেন। যাতে লোকে পাপ না করে, তাই কেন করেন না? তা হলে তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়। বার বার তাঁকে অত কষ্ট করে অবতার হয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাতে হয় না।"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই, স্ত্রীর চোখের ওপর চোখ রেখে চিৎকার করে উঠলেন ঃ

"কথায় কথায় ভগবানের দোহাই দাও। জান, ভগবানকে সৃষ্টি করেছে কে? ভগবানের সৃষ্টিকর্তার নাম বলতে পার?"

ধমক দিয়ে উঠলেন ইন্দুমতী ঃ

"কি সৃষ্টিছাড়া কথা! ভগবানকে আবার সৃষ্টি করবে কে? তিনিই তো সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।"

ইন্দুমতীর চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই ঃ

"ভুল, মিথ্যে কথা, মনগড়া কথা। নিজের কথাতেই নিজে ধরা পড়ে যাচ্ছ। ভগবান যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তা হলে তিনি চোর জোচ্চোর খুনে বিশ্বাসঘাতকদেরও সৃষ্টি করেছেন! পাপও তাঁর সৃষ্টি, পাপীও তাঁর সৃষ্টি! তা হলে আগেই শাস্তি দাও তোমার ভগবানকে, সাজা দাও ওদের সৃষ্টি করেছেন বলে। যারা ঘুষ নেয়, ভেজাল দেয়, দুর্নীতির পাঁকে সমস্ত জাতটাকে পোঁতবার চেষ্টা করে, তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ধরে আগুনে পোড়াও। আরও জঘন্য আরও পৈশাচিক কোনও মতলব যদি মাথায় গজায়, তাই চালাও ভগবানের ওপর। কুশ্রী কিম্ভূতকিমাকার কদর্য সৃষ্টি করার ফল ভোগ করুন ভগবান। তাঁর অন্যায়ের জন্যে মানুষের ওপর হন্যে হয়ে উঠছ কেন?"

থতমত খেয়ে গেলেন ইন্দুমতী। বলে ফেললেন ঃ

"সে ভগবানকেই বা পাওয়া যাচ্ছে কোথায় ?"

"তবে ?"

রুখে উঠলেন আবার রুদ্রমশাই :

"তবে কেন খামকা তাঁর দোহাই পাড়ছ ? যাকে পাওয়াই যায় না, তাকে নিয়ে কথায় কথায় টানা-হ্যাঁচড়া করতে যাও কেন ? কেন পাওয়া যাবে না ভগবানকে ? যারা ভগবান সৃষ্টি করেছে, তাদের পাকড়াও কর। কোথায় সেই ভগবান আছে, দেখিয়ে দিক তারা।"

"কে, কারা সৃষ্টি করেছে ভগবান ? কাদের আমি ধরতে যাব ভগবানের জন্যে ?"

বোকার মত প্রশ্ন করলেন ইন্দুমতী।

"জান না ? আচ্ছা বোকা তো! জান না ভগবানের সৃষ্টি-কর্তার নামটা ?"

মস্ত একটা মজার কথা বলছেন যেন রুদ্রমশাই। বললেন :

"কি আশ্চর্য, ভগবানকে কে সৃষ্টি করল তাও জান না ? দু অক্ষরের ছোট্ট নাম তার। বলব ?···না, তুমিই বল। বেশ করে মাথা ঘামিয়ে বল। দেখি, কতখানি বুদ্ধি আছে তোমার ঘটে।"

হেসে ফেললেন ইন্দুমতী। এবার সত্যিই অকপট হাসি হেসে ফেললেন। বললেন :

"বলবে তো—ভূত। তোমার মতলব জানি। চিরকাল একভাবে কাটল। এখনও একটু বিশ্বাস হল না ভগবানের ওপর।"

রুদ্রমশাইও হাসলেন, কিন্তু সে হল মরা হাসি। বললেন :

"হল না ইন্দু। কাছাকাছি গেছ বটে, কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিকর্তার নামটা ঠিক বলতে পার নি। ভূত নয়, ভয়। ভয় থেকে ভগবানের সৃষ্টি। যার ভয় করে না, সে কোন্ গরজে ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে ? অন্যায় না করলে কেউ ভয় পায় না। অন্যায় করে লোভে পড়ে। যার কোন কিছুর ওপর লোভ নেই, তার

ভয়ও নেই! আর যার ভয় নেই, তার ভগবানও নেই। অন্যায় করলে পাপ হয়, পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই। যাঁর দোহাই পাড়লে প্রায়শ্চিত্তটাকে ফাঁকি দেওয়া যায়, তিনিই হলেন ভগবান। আগুনে হাত দেব, কিন্তু হাতখানা পুড়বে না,—এই জাতের আকাশফাটা আবদার করার জন্যে মানুষের মগজে ভগবান জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পরও যদি হাত পুড়ে যায়, তখন সেটাকে পোড়া কপালের দোষ বলে ভগবানকেও রেহাই দেয়। ভগবান থেকে ভাগ্য, ভাগ্য থেকে ভবিতব্য। তার পর আর দোহাই পাড়ার কিছু থাকে না। তলিয়ে যাও, ওর যে কোনও একটির দোহাই পাড়তে পাড়তে তলিয়ে যাও। তলিয়ে যাওয়াটা বেশ সহজ হবে।"

তলিয়ে যাও তলিয়ে যাও—এমন সুরে এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন কথা দুটি রুদ্রমশাই যে ইন্দুমতী সত্যিই বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। সত্যিই যেন তিনি পড়ে গেছেন দ'য়ে, নীচের টানে তলিয়ে যাচ্ছেন। খপ্ করে ধরে ফেললেন রুদ্রমশায়ের হাত একখানা। বলে ফেললেন:

"কি সব যা-তা বলছ!"

"ভয় পেয়েছে—হা হা হা হা—"

হাসি জুড়ে দিলেন রুদ্রমশাই। হাসির বেগে দুলতে দুলতে বললেন:

"এতেই ভয় পেয়েছে। হা হা হা হা—এই বার ভগবানকেও পাবে—হা হা হা হা। লোভ, লোভ থেকে অন্যায়, অন্যায় থেকে ভয়—হা হা হা হা। লুকিয়ে ফেল ইন্দু, শিগ্গির তোমার ভয়টাকে ভগবানের আড়ালে লুকিয়ে ফেল। কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে, এখনই তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি ভগবানের পেছনে লুকিয়ে ফেল তোমার লোভ, ভগবান দিয়ে চাপা দাও তোমার লোভ, ভগবানের তলায় চাপা দাও তোমার অন্যায়কে। ব্যাস—আর ভয় থাকবে না।"

উচ্ছৃঙ্খল উৎকট হাসি হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রুদ্রমশাই। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ইন্দুমতী। সঙ্গে যাবার জন্যে পা বাড়াতেও ভুলে গেলেন।

ভয়! ভয় পেলেন যেন ইন্দুমতী। ভয়টা ঠিক কিসের, তা না বুঝেই বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। ভগবান আছেন বা নেই, এ সমস্ত বড় কথা নিয়ে তিনিও বড় একটা মাথা ঘামান না। মঙ্গলময় ঈশ্বর, মাঝে মাঝে স্বামী-পুত্রের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময়ের দ্বারস্থ যে হন নি, তা নয়। তবে সেটা অনেকটা দায়-সারা গোছের ব্যাপার। ভগবানের ওপর যত না বিশ্বাস ছিল তাঁর, তার চেয়ে অনেক বিশ্বাস ছিল নিজের সহ্য করবার শক্তির ওপর। অনেক পেয়েছেন তিনি, অনেক হারিয়েছেন। কিংবা কিছুই পান নি, হারান নিও কিছু। এবার যেন সত্যিই এমন কিছু হারাতে বসেছেন, যাতে তাঁর আতঙ্ক হচ্ছে!

কি সে জিনিসটা!

ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন ইন্দুমতী, সে জিনিসটা কি যা খোয়া যাবার দুশ্চিন্তায় তাঁর বুকের ভেতর ছম ছম করছে!...স্বামীর বিশ্বাস!...একমাত্র সন্তানের জীবন!...নিজের মান-সম্মান!

না, এ সমস্ত কিছুই নয়। অনেকদিন আগেই ইন্দুমতী মামুলী ভাবনাচিন্তাগুলোকে বিসর্জন দিয়েছেন। না দিলে যে তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকারই উপায় ছিল না। মস্ত বড় স্বামী, মস্ত বড় নামের নেশায় মাতাল হয়ে ঘরকে ঘর বলে ভাবতে পারতেন না। ঘরের বাইরে ছিল তাঁর শান্তি, ঘরটা ছিল নেহাতই একটা ফালতু উপদ্রব তাঁর জীবনে। ঘরের সমস্যা নিয়ে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ বক্তৃতা কিছুই যখন ফাঁদা যায় না, তখন আর কে গ্রাহ্য করে ঘরকে। ঘরের বাইরের দুনিয়াটাকে চেনবার চেষ্টা করতেন, ঘরের ভেতরের জগৎটা চিরকালই স্বামীর কাছে অপরিচিত রয়ে গেল। এজন্যে

বিন্দুমাত্র আক্ষেপও ছিল না ইন্দুমতীর। স্বামীর জগদ্দল-প্রমাণ নামের তলায় চাপা পড়েই তিনি জীবনটা হাসি মুখে কাটিয়ে দিয়েছেন।—তার পর এল ছেলে। বড় হল, লেখাপড়া শিখল। শিখে প্রথম কথা যা জানতে চাইল তা হচ্ছে,—এত দুর্নীতি কেন চতুর্দিকে? মানুষ এমন হীন হল কেন? হাত পেতে ঘুষ নিতে কেন লজ্জা করে না মানুষের? হাত তুলে ঘুষ দিতে অপমানে মাথা কাটা যায় না কেন ঘুষদাতার? আর ভেজাল,—এমন কোন্ জিনিসটি বিক্রী হয় দেশে, যাতে ভেজাল দেওয়া হয় না?

গবেষণা শুরু করে দিলে। ছেলের নামে ছাপা হয়ে বেরল রাশি রাশি প্রবন্ধ বক্তৃতা আর হিসেবপত্র। মস্ত বড় শান্তনু রুদ্রের ছেলেও মস্ত বড় হয়ে উঠল ঘুষ ভেজাল ধরাধরির গবেষণা করতে করতে। বাড়ির মধ্যে তো আর ঘুষ নেই, মায়ের স্নেহে তো আর ভেজাল নেই! বাপ হলেন এমন বাপ যে ধরাধরি করার জন্যে তাঁর ধারে কাছে পৌঁছনোই ছেলের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ছেলেও বাড়ির কথা বেমালুম ভুলে গেল।

তার পর—

তার পরের ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে ইন্দুমতীর। চনচন করে রক্ত চড়ে যায় তাঁর মাথায়। তার পরে যা ঘটে গেল হঠাৎ, তা ঘুষ ভেজাল ধরাধরি নয়। তা হচ্ছে স্রেফ ঠকানো। অতি ধূর্ত বাপ ভয়ানক ধড়িবাজ ছেলের সঙ্গে মতলব এঁটে তাঁকে ঠকালে। এমন ঠকানোই ঠকাল যে শেষ নিঃশ্বাস যতদিনে না ফেলছেন তিনি, ততদিন তাঁকে মুখ টিপে থাকতে হবে। মুখ টিপে থেকে রুদ্রদের টাঁইশ সইতে হবে।

আঙ্গুল মটকাতে শুরু করলেন ইন্দুমতী। চরম অসহায় অবস্থায় পৌঁছলে আঙ্গুল মটকানো ছাড়া আর কি করতে পারে মানুষে!

একখানা গির্ধড় গোছের কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরে

ঢুকল কে। সে বেচারার অবস্থাটাও চরমে পৌঁছে গেছে। অস্বাভাবিক এক জাতের নাকীসুর বার করছে সে কম্বলের ভেতর থেকে। মাত্র চোখ দুটি আর নাকের ডগাটি দেখা যাচ্ছে। ভেতর থেকে খামচে ধরেছে কম্বলটা ঠিক নাকের নীচে। কম্বলের ওপর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে তার কাঁপুনি। ঘরে ঢুকে কাঁপুনির চোটে বেচারা খাড়া হয়েও থাকতে পারল না। মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল।

আঁতকে উঠলেন ইন্দুমতী :

"কি হয়েছে বাবা! জ্বর এসে গেল নাকি!"

"ই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ, শীত। ওঁরে বাঁপরে, শীঁতের গুঁতোয় নির্ঘাত মঁরে যাঁব।"

শুনে হাসির আভাস ফুটে উঠল ইন্দুমতীর চোখে। বললেন :

"খুব শীত করছে বুঝি! দাঁড়াও, প্রধানজীকে বলে আগুনের ব্যবস্থা করি। অন্ততঃ গোটা কতক হট্-ওয়াটার ব্যাগ—"

"উঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, দঁরকার নেই আঁর কিছুর ব্যবস্থা কঁরে। চঁলুন সরে পড়ি এখন ভাঁলয় ভাঁলয়।"

আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইন্দুমতী। চোখ বড় বড় করে বললেন :

"ও মা সে কি কথা! এই এলাম, আবার এখুনই চলে যাব!"

"তঁবে থাঁকুন। আমি আঁজই পাঁলাব। উঁরে বাঁবারে, ইঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কম্বল-মুড়ি দেওয়া মূর্তিটি, কোনও রকমে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। কিন্তু দরজা পেরোতে পারল না। ঝুড়ি ঝাঁটা নিয়ে তিনটি লোক ঘরে ঢুকল। তার পেছনে দেখা গেল প্রধানজীকে। দরজার ওপর দাঁড়িয়ে নেপালী ভাষায় কি বললেন লোক তিনটেকে। তৎক্ষণাৎ তারা কাজে লেগে গেল।

তখন প্রধানজীর নজর পড়ল ইন্দুমতীর দিকে। একটুখানি মাথা নুইয়ে বললেন :

"রাত্রে খুবই কষ্ট হল তো ভাবীজী। একখানা চৌকি, শুতেও পান নি বোধ হয়। কি করা যায়। গোঁ ধরে বসলেন রুদ্রজী, কিছুই সরানো যাবে না ঘর থেকে। এই ফাঁকে ঘরটা সাফ করিয়ে আর একখানা চৌকি ঢুকিয়ে দিচ্ছি। গদিগুলো তৈরী করাতে দু-এক দিন সময় লাগবে। কি করি বলুন, ইঁদুরে যে এমন অবস্থা করে ছেড়েছে, তা কি আন্দাজ করতে পেরেছি আগে।"

প্রধানজীর সুরে বেশ একটু লজ্জা ফুটে উঠল। লজ্জাটুকু চাপা দিতে গেলেন ইন্দুমতী! তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন :

"না না, তাতে কি হয়েছে। নতুন জায়গায় এসে এরকম একটু-আধটু অসুবিধে হয়ই। আপনি মিছিমিছি—"

"একদম মিছিমিছি।"

কম্বলের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরল :

"নির্ঘাত মিছিমিছি। কিছু করতে হবে না, শুধু ফেরবার টিকিট ক'খানি কেটে ফেলতে হবে। আজ সন্ধ্যের আগেই যাতে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারি।"

হকচকিয়ে গেলেন প্রধানজী। এতক্ষণ তিনি লক্ষ্য করেন নি কম্বল-ঢাকা প্রাণীটিকে। তার ওপর আচমকা এই যাবার প্রস্তাব। বললেন :

"কে, ও কল্যাণ সাহেব! তা ওভাবে কম্বল ঢেকে রয়েছেন যে! অসুখ করল নাকি।"

মাথার ওপর থেকে কম্বল নামিয়ে তেড়ে উঠল কল্যাণ :

"সুখটা আছে কোথায় এখানে যে সুখের অভাব ঘটতে যাবে? এই রাজ্যে সুখ আছে শুধু তোমার ঐ ধেড়ে ইঁদুরের গুষ্টির। গর্তে সেঁদিয়ে শীতের গুঁতো থেকে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। খামকা কেন ঘর-দরজা সাফ করছ প্রধান মহারাজ। গর্ত বানিয়ে দাও, মেঝের এই

কাঠগুলো সরিয়ে গর্ত বানাও, তার ভেতর ঢুকে আমরা লেজ নাড়তে থাকি।”

মুচকি হাসিতে প্রধানজীর ঠোঁট দুখানি একটু কুঁচকে উঠল। ইন্দুমতী বললেন :

“হ্যাঁ, এই ছেলের আমার শীতটা একটু বেশী ঠাকুরপো। ওর ঘরে একটু আগুনের ব্যবস্থা করা যায় না?”

প্রধানজী বললেন :

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি। লাইন ঠিক হলেই কল্যাণবাবুর ঘরে আগে একটা হিটার জ্বালিয়ে দেব।”

“আঁবার হিটার—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ—তাঁর চেয়ে দাঁদা একখানা টিঁকিট যদি পেঁতাম—”

আশিগুণ বেড়ে গেল কাঁপুনি কল্যাণের। তাড়াতাড়ি সে মুখ মাথা ঢেকে ফেললে।

প্রধানজী আর কথা বাড়ালেন না, যারা ঘর ঝাড়ু দিয়ে জঞ্জাল তুলছিল ঝুড়িতে, তাদের তাড়া লাগালেন :

“নে নে, জলদি কর। এখুনি হয়তো এসে পড়বেন রুদ্রজী।”

“এসে আমি পড়েছি গুলাব।”

বলতে বলতে দরজার এধারে পা দিলেন রুদ্রমশায়। তখনও তিনি মুখ-হাত মুছছেন তোয়ালে দিয়ে। মোছা বন্ধ করে তাকালেন চতুর্দিকে। তার পর একে একে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। হুকুম অমান্য করে পরিষ্কার করা হচ্ছে ঘরখানা, এ জন্যে বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ইন্দুমতী। প্রধানজী নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগলেন। কল্যাণ কম্বল টেনে নাকটা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল। রুদ্রমশাই মাথা নীচু করে এগিয়ে গেলেন খাটের দিকে। খাটের উপর বসে পা মুছতে মুছতে বললেন :

"নোংরা সব সাফ করতে পারবে তো গুলাব ভাই? ওপরে নোংরা, ভেতরে নোংরা, আকাশ-বাতাস আলো সর্বত্র নোংরা। নোংরায় নোংরায় সবই যে বিষিয়ে উঠেছে! কতটুকুই বা আমরা দেখতে পাই গুলাব? নজর কি সব জায়গায় পৌঁছয়? কত দূর তুমি সাফ করতে পারবে?"

জবাব দিলেন না কেউ। এ সমস্ত কথার জবাব নেই।

"যাই, চা নিয়ে আসি।"

বলে ইন্দুমতী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুদ্রমশাই তাঁর বক্তব্যের জের টেনে বলতে লাগলেন:

"এই নোংরা ঘাঁটার মেয়াদই বা আমাদের কতটুকু! নোংরা ঘুচিয়ে ছুনিয়াটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে গেলে দেখা যাবে, মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। এতটুকু নোংরা ঘুচল কি ঘুচল না, কিন্তু ডিউটি শেষ হয়ে গেল। গোটাও পাততাড়ি তখন। বুক-ভরা আক্ষেপ নিয়ে রওয়ানা দিতে হল, নোংরা তো কই ঘোচাতে পারলাম না। মিথ্যা চেষ্টা করছ গুলাব, ওতে শুধু নিজের অভিমান খানিকটা তৃপ্তি পাবে, আর কোনও ফল ফলবে না।"

এবারও কেউ কিছু বললেন না। পালিয়ে যাবার জন্যে উসখুস করতে লাগল কল্যাণ। প্রধানজী আবার তাঁর লোকদের তাড়া দিলেন। রুদ্রমশায়ের পা মোছা হয়ে গিয়েছিল, পা গুটিয়ে জুত করে বসলেন তিনি। বসে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"ও কি! ও ভাবে নিজেকে ঢেকে বেড়াচ্ছ যে। লজ্জা করছে বুঝি, খুবই লজ্জা করছে বোধ হয় মানুষকে মুখ দেখাতে, নয়?"

ঝাঁ করে কম্বলখানা খুলে ফেলে বলে উঠল কল্যাণ:

"লজ্জা! কি মুশকিল! লজ্জা করবে কেন?"

"তা হলে নিশ্চয়ই ঘেন্না করছে। কুচ্ছিত চাউনি দিয়ে পাছে কেউ দেখে তোমায়, এই ঘেন্নায় বুঝি ঢেকে রেখেছ নিজেকে?"

একান্ত ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করে বসলেন রুদ্রমশাই।

দস্তুর মত ফাঁপরে পড়ে গেল কল্যাণ, তোতলাতে লাগল মহা অপ্রতিভ হয়ে ঃ

"না না তা কেন। এমনিই—মানে—এই—"

"ও—শুধু ভয়ে। লজ্জায় নয়, ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছ। তা বেশ, তা বেশ, নিজেকে যদি অদৃশ্য করে ফেলতে পার, তা হলে একরকম মন্দ হয় না।"

বলে রুদ্রমশাই নিজের কম্বলখানা টেনে নিলেন কোলের ওপরে। কেন ওভাবে কম্বল মুড়ি দিয়েছিল কল্যাণ, এ সমস্যার কিনারা করতে পেরে বেশ নিশ্চিন্ত হলেন যেন। কল্যাণ কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে রুদ্রমশায়ের সমাধানটা মেনে নিতে পারল না। বেশ একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল তার কথায়, বলল ঃ

"কিসের ভয় ? ভয় আমি করি না। কি করে ভয় পেতে হয়, তা আমি জানিই না।"

"এ্যাঃ—বল কি !"

রুদ্রমশায়ের দুটো চোখ ফেটে পড়ার মত হয়ে উঠল, এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি কল্যাণের দিকে যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীব দর্শন করছেন। সেই ভাবে তাকিয়ে চাপা স্বরে আবার বলতে লাগলেন ঃ

"রাক্ষস ! আস্ত রাক্ষস ! গুলাব প্রধান, সাবধান হও। আস্ত রাক্ষস দাঁড়িয়ে সামনে, ভয় কাকে বলে জানেই না। তার মানে হল, ভালবাসা কাকে বলে তাও জানে না। ভালবাসা, তা সে মানুষের ওপরেই হোক, পশু-পক্ষী জীবজন্তু বা পাথর ফল ফুলের ওপরেই হোক, ভালবাসলেই বিপদ। ভালবাসার সামগ্রীটা পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত থাকে। খোয়া যাবার ভয় যেখানে নেই, সেখানে ভালবাসাও নেই। রাক্ষস ভালবাসতে জানে না। কোনও কিছুর ওপর রাক্ষসের মায়া নেই। রাক্ষসই শুধু বলতে পারে, ভয় কি জিনিস তা সে জানেই না। রাক্ষস তো কখনও

দেখ নি গুলাব, ঐ দেখ ঐ, ঐ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মূর্তি ধারণ করে। সাবধান—খুব সাবধান—"

কি ভীষণ সুর! কি ভয়ঙ্কর বলার কায়দা! কি মর্মন্তুদ উচ্চারণভঙ্গী!

হাত-পা অসাড় হয়ে এল কল্যাণের, বুকের ভেতর কি রকম যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন টেনে নিয়ে চলল তাকে রুদ্রমশায়ের দিকে। গা থেকে খসে পড়ে গেল কম্বলখানা, বোধ হয় সে তা টেরও পেল না। একটু একটু করে এগিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল:

"আমি তো সে কথা—মানে—আপনি আমায় ভুল বুঝলেন।"

রুদ্রমশাই তখনও সেইভাবে তাকিয়ে আছেন। ভয় অবিশ্বাস হতাশা, সব একসঙ্গে গ্রাস করেছে যেন তাঁকে। সত্যিই যেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। দম বন্ধ করে আওড়াতে লাগলেন তিনি:

"মায়া নেই, দয়াও নেই, স্নেহ জানে না, ভালবাসা বোঝে না, শুধু জানে ক্ষুধার জ্বালা। রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে ঘৃণা লজ্জা ভয় সব ভস্ম হয়ে যায়। সব গিলে খায় রাক্ষস, রাক্ষসের গ্রাস থেকে কিছুই রক্ষা পায় না।"

সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল কল্যাণ রুদ্রমশায়ের কোলের ওপর। কোলে মুখ গুঁজে আকুল আর্তনাদ করে উঠল:

"রক্ষা করুন, বাঁচান আমাকে। ও রকম করলে আমি মরে যাব।"

আস্তে আস্তে একখানি হাত তুলে কল্যাণের মাথার ওপর রাখলেন রুদ্রমশাই। প্রধানজীর দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। অদ্ভুত জাতের এক খুশির আলো জ্বলে উঠল তাঁর চোখে-মুখে। যারা জঞ্জাল কুড়োচ্ছিল, তাদের টুকরি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল।

প্রধানজীর নীরব আদেশে তারা টুকরি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। রুদ্রমশায়ের গলার সুর, বলার ধরন সব পালটে গেল। শ্রাবণ-আকাশের মত জলে মেঘে টইটম্বুর হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ। এবার যে ভাষা যে সুর আমদানি করলেন তিনি, সেই ভাষা সেই সুর শ্রাবণের নিঝুম নিশীথে অঝোর ঝরায় ধরা পড়ে। বলতে লাগলেন কল্যাণের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে :

"তা হলে! তা হলে কি ভুল করলাম!···ভুলই করেছি, নিশ্চয়ই সব গোলমাল করে ফেলেছি। যা সন্দেহ করেছি, ঠিক তাই। রাক্ষসের রাক্ষুসে ক্ষুধার চরম পরিচয় পেয়েছে এ, রাক্ষুসে দাঁতের পেষণে বুকের হাড়গোড়গুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিছুই করতে পারে নি। অসহায়ভাবে শুধু তাকিয়ে থেকেছে। সেই অসহায়তা অসাড় করে ফেলেছে এর মনের শীত-গ্রীষ্ম বোধ। তাই এ ভুলে গেছে ঘৃণা লজ্জা ভয় কাকে বলে। জ্বলছে, শুধু জ্বলছে। জ্বলন্ত চিতায়—"

আর বলতে হল না রুদ্রমশাইকে, আস্তে আস্তে মাথাটা তুলতে লাগল কল্যাণ। অতি ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মুখ-চোখের। অতি কদর্য ভাবে কুঁচকে গেছে নাক, চোখ, কপাল। রুদ্রমশায়ের কোলের ওপর থেকে মুখ তুলে মাটির দিকে তাকিয়ে তু পা পিছিয়ে দাঁড়াল। তার পর বেরোতে শুরু করল তার মুখ থেকে আগুনের হলকা। দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে ধরিত্রীকেই যেন শোনাতে লাগল সে :

"হ্যাঁ, জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মুখে আমি পাথর চাপা দিয়েছি। সেই পাথর-চাপা অগ্নিকুণ্ড বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। কেউ জানতে পারে না, পাছে এতটুকু আঁচ বাইরে ফুটে বেরোয়, এই ভয়ে হাসি-তামাশায় সব ঘুলিয়ে দিই। আপনি সেই পাথরখানা আজ তুলে ফেলেছেন। আপনি দেখতে পেয়েছেন সে আগুন। আপনাকে ভাল করে সেই আগুনে সেঁকে

ছাড়ব।···শুনুন তবে, মন দিয়ে শুনুন, কি ভাবে কেমন করে রাক্ষস হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি।···ভদ্দরলোকের ঘরে জন্মেছি, লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলাম। ভাল কাজ পেয়ে গেলাম। সরকারী চাকরি, ভাল মাইনে, থাকবার জায়গা।—ওপরওয়ালা খুশী, ভারি খুশী আমার কাজে। খুশির চোটে বকশিশ দিয়ে ফেললেন। নামজাদা বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে ফেললেন। বাড়ি-গাড়িসুদ্ধ একটি স্ত্রী। বিয়ে হল।···বউ পার্টিতে গেল, বন্ধুর বন্ধুকে নিয়ে মুসৌরী উটাকামণ্ড গেল। বিয়ের তিন মাস পরে মাদ্রাজের কোন নার্সিং-হোমে একটা সন্তান জন্মাল। শ্বশুরমশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বেয়াদবের মত কথা বলার দরুন আমি চাবুক খেলাম। ওপরওয়ালা যিনি, তিনি আফিসের কাজে গণ্ডগোল করার দরুন জেলে দেবার ভয় দেখালেন। তারও পরে যদি শুনতে চান তো শুনুন, এই দার্জিলিঙের এক হোটেলে ওপরওয়ালার সঙ্গে আমার বিয়ে করা বউকে এক দিন ধরলাম। এখানকার সবচেয়ে নামজাদা হোটেলের একটা ঘরে মিস্টার এবং মিসেস্ চক্রবর্তী তখন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিলেন। হতভাগা লোফারটাকে বেশ করে ঘা-কতক দেবার হুকুম দিলেন চক্রবর্তী সাহেব। মিসেস্ চক্রবর্তী তাঁর এক পাটি জুতো তুলে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। হোটেলের লোকজনেরা ধাক্কা মারতে মারতে ছিটকে ফেললে আমায় রাস্তার ওপর। পুলিসে আর দিলে না।”

হন্যে কুকুরের মত অনেকগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল কল্যাণের। এই পর্যন্ত বলেই সে হাঁই-হাঁই করে হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ প্রধানজী কথা বলে ফেললেন ঃ

“হাঁ হাঁ, বছর পাঁচ-ছয় আগে ঐ রকমের একটা কাণ্ড ঘটেছিল বটে। সেই চক্রবর্তী সাহেবের তো পরে জেলও হয়েছিল, খবরের কাগজে আমরা পড়েছিলাম যেন! কি এক মধুচক্র না কি নামের চক্র বানিয়ে ঐ সব ব্যবসা চালাচ্ছিলেন তিনি কলকাতায়—”

খ্যাক-খ্যাক করে অতি বিতিকিচ্ছি হাসি হাসতে লাগল কল্যাণ। হাসতে লাগল না কাশতে লাগল, ঠিক বোঝা গেল না।

প্রধানজী নিজের বক্তব্য শেষ করেন নি তখনও। বললেন:

"এখানকার সেই হোটেলটার কিন্তু জাত গেল। সুনাম নষ্ট হল। বদনামের ভয়ে খদ্দের গেল না আর। শেষে হোটেলওয়ালা বেচারাকে দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পাহাড় ছেড়ে পালাতে হল।"

বেচারা হোটেলওয়ালার দুঃখেই যেন বড্ড বেশী কাবু হয়ে পড়লেন প্রধানজী।

চুপ করে শুনছিলেন সব এতক্ষণ রুদ্রমশাই। হঠাৎ হাসি জুড়ে দিলেন,—হা হা হা হো হো হো—ঘর-কাঁপানো হাসি। হাসির দমকে দু জনেই ঘাবড়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

ট্রে-ভরতি চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ইন্দুমতী। হাসির ধাক্কায় তিনিও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। ব্যাপারটি কি আন্দাজ করার জন্যে সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। রুদ্রমশায়ের চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই তিনি হাসি বন্ধ করে একটি কবিতা আওড়ালেন—

"মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে শান্ত করছে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি বহে সাপের চোখে॥"

"তার মানে!"

কবিতা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইন্দুমতী। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ট্রে নামালেন রুদ্রমশায়ের পাশে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন:

"তার মানে?"

"মানে হল, কল্যাণের হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনার ফল ফলল। গুলাব প্রধান বেচারা হোটেলওয়ালার দুঃখে গলে গেল।"

নেহাত ভালমানুষের মত কবিতার মানেটি বলে রুদ্রমশাই নির্বিকারভাবে একখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

ভয়ানক যেন মুষড়ে পড়ল কল্যাণ। কেন সে বলতে গেল তার গোপন কাহিনী এঁদের সামনে। বলবার ফল তো এই হল যে এঁরা হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিলেন। লজ্জায় ক্ষোভে মাটির সঙ্গে মিশে যাবার মত অবস্থা হল তার। মুখ নীচু করে গুটিগুটি দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

বিস্কুটপোরা মুখে রুদ্রমশাই বললেন:

"উঁ হুঁ হুঁ, পালাচ্ছ কেন? তোমার চেয়ে ঢের বড় ঠকান ঠকেছি আমি। তাতে কি হয়েছে, তা বলে কি লোকের কাছে মুখ লুকিয়ে আছি না পালিয়ে বেড়াচ্ছি?"

গুরুতর একটা কিছু আন্দাজ করতে পারলেন এতক্ষণে ইন্দুমতী। ছুটে গিয়ে পথ আগলালেন কল্যাণের। মায়ের মত করে বলে উঠলেন:

"কি হয়েছে বাবা! অমনভাবে চলে যাচ্ছ যে!"

ডাকের মত ডাক হলে একটি ডাকই যথেষ্ট। কল্যাণ ফিরল, ফিরে এসে বসে পড়ল মেঝের ওপর। বসে নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

নির্বিকার রুদ্রমশাই একের পর এক বিস্কুট তুলে মুখে পুরতে লাগলেন।

আগুন জ্বলে উঠল।

মশালের মত দাউদাউ করে জ্বলে উঠলেন ইন্দুমতী। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পর পর তাকালেন সবাইর দিকে, শেষে স্বামীর ওপর নজর স্থির রেখে বললেন:

"আবার সেই খেলা খেলছিলে বুঝি! কথার মারপ্যাচের খেলায় এই ছেলেটাকে খুবই জব্দ করতে পেরেছ—না? তাই অত খুশী হয়ে বসে বিস্কুট চিবোচ্ছ—কেমন?"

বিস্কুট চিবোনো বন্ধ হল না রুদ্রমশায়ের, ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের কোণ দিয়ে একটু দেখে নিলেন ইন্দুমতীর মুখখানা। দেখে আর একখানা বিস্কুট মুখে পুরে ফেললেন।

"কি—জবাব দিচ্ছ না যে ?"

ক্ষেপে-যাওয়া সর্পিণীর মত ফণা তুলেছেন তখন ইন্দুমতী।

ভয় পেয়ে গেলেন গুলাব প্রধান। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ঃ

"না না, সে সব কিছু নয়। কল্যাণবাবু তাঁর নিজের দুঃখের কথা বলছিলেন। যা তিনি কখনও কাউকে বলেন নি, সেই সব আজ মন খুলে বলে ফেললেন রুদ্রজীকে। তাই—"

অস্বাভাবিক জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন ইন্দুমতী ঃ

"তাই অত হাসাহাসি হচ্ছিল—কেমন ?"

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রমশায়ের সামনে। সমান জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ

"মানুষের নাড়ীনক্ষত্রের খবর জেনে বড় মজা পাও—না ? কেউ কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না তোমার জ্বালায়। শুধু অভিনয় আর শুধু কথার ভেলকিবাজি। চিরটা কাল একভাবে কাটল। দেশসুদ্ধ মানুষ মাথায় তুলে নেচেছে, আহা রে, কি ক্ষমতা অমুক রুদ্রের! মানুষের মনের কথা কি ভাবেই না পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাখ্যান করতে পারে। দেশের মানুষ তো আর জানে না, কি জ্বালায় জ্বলে মরেছি আমি সারাটা জীবন ওই ক্ষমতাটির জন্যে। দয়া নেই, মায়া নেই, পাপপুণ্যজ্ঞানহীন নিরেট পাষাণের সঙ্গে ঘর করতে হলে কি অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়, তা যদি জানতে পারত দেশের মানুষে! এখনও গেল না সেই স্বভাব ? পেটের ছেলে বিসর্জন দিলুম, তবু তোমার স্বভাব পালটাল না ?"

চায়ের কাপ মুখে তুললেন রুদ্রমশাই। আওয়াজ করে এক চুমুক চা টেনে নিয়ে মুখের ভেতরে নাড়াচাড়া করে গিলে ফেললেন। বিস্কুটের গুঁড়ো গলা দিয়ে নামবার ফলে মুখটা

পরিষ্কার হল। পরিষ্কার মুখে পরিষ্কার গলায় অকপট বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল ঃ

"এ্যাঁ! বল কি! স্বামীর স্বভাব বদলাবার জন্যে পেটের সন্তানকে বিসর্জন দিলে!"

"হ্যাঁ, তাই দিয়েছি আমি। যা কোনও মা করে না তাই করেছি। যে আপদ অষ্টপ্রহর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে তুমি, সেই আপদ দূর হলে যদি তুমি বদলাও—এই আশায় সেটাকে বিদেয় করেছি। ছেলেও যখন আবদার ধরলে, সেই জিনিসটা তার চাই, সেই জিনিসটা পেলেই সে দুনিয়া থেকে নষ্টামি ইতরামি ঘুচিয়ে ফেলতে পারবে, তখন সেটা দিলাম তার হাতে তুলে। ফলে ছেলেও গেল। কিন্তু তবু তোমার স্বভাব বদলাল না। এখনও মানুষের মনের কথা মন উজাড় করে বার করে নিয়ে তুমি মজা পাও। মনের ভেতর নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে রেখে শান্তিতে কেউ বেঁচে আছে, এ তোমার সহ্য হয় না। মানুষকে নাকাল করার নেশা তোমার এখনও গেল না। সেই হতচ্ছাড়া জিনিসটা সঙ্গে থাকলেও যা, না থাকলেও তা। লোকের নাড়িভুঁড়ি টেনে তুমি বার করবেই। তুমি—"

আর বলতে হল না ইন্দুমতীকে। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে খাটের ওপর থেকে নেমে এলেন রুদ্রমশাই। নিদারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে তাকে ঘিরে। দু হাত পেছনে নিয়ে আঙ্গুলে আঙ্গুলে পেঁচিয়ে ফেললেন। ঝুঁকে পড়লেন অনেকটা সামনে। তার পর শুরু করলেন পায়চারি। উৎকট সমস্যায় পড়ে গেছেন যেন, কোনও দিকে কোনও কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছেন না। গুরুগম্ভীর অবস্থা ধারণ করতে দেখেই বোধ হয় ঝপ করে থামালেন মুখ ইন্দুমতী। মুখ সামলে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর পানে। হঠাৎ সব চুপ হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় কল্যাণ মুখ তুলল। মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রুদ্রমশায়ের

দিকে। প্রধানজী কিন্তু এক তিল নড়লেন না, হেঁটমুণ্ডে নিজের জুতোর মাথার গড়নটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন।

বার দুই পায়চারি করে থামলেন রুদ্রমশাই স্ত্রীর সামনে। মুখ তুলে ভাল করে দেখতে লাগলেন ইন্দুমতীকে। অস্বস্তিকর অবস্থা, মুখের কাছে মুখ নিয়ে কেউ যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে তা হলে কতক্ষণ মানুষ মুখ বুজে সহ্য করতে পারে। ইন্দুমতী দু পা পিছিয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন :

"এ আবার কি আদিখ্যেতা! কি দেখছ অমন করে?"

আবার মুখ নীচু হয়ে গেল রুদ্রমশায়ের। দু বার তিনি মাথা নাড়লেন দু পাশে। তার পর বিড়বিড় করে বকতে বকতে পায়চারি শুরু করলেন আবার।

"কি দেখছি? তাই তো—কি দেখছি আর কি শুনছি! মা নিজের সন্তানের মুখে বিষ তুলে দিচ্ছে। নিজের মনটাকে স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে নিজের সন্তানের হাতে এমন জিনিস তুলে দিচ্ছে যে তার পর আর কারও মন জানতে তার বাকি থাকবে না। তখন সে তার মাকেই বা কি চোখে দেখবে!"

সজোরে প্রতিবাদ করে উঠলেন ইন্দুমতী :

"দেখুক, কোনও ক্ষতি নেই তাতে। মায়ের বুকে সন্তানের জন্যে যা থাকে তাতে কোনও ভেজাল নেই।"

"নেই, নিশ্চয়ই নেই। একশ বার মানছি, সন্তানের ওপর মায়ের যে টান, সেই টানের মধ্যে ভেজাল থাকতে পারে না।"

মাথা নাড়তে নাড়তে তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন রুদ্রমশাই। তার পর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে চুপিচুপি একটি প্রশ্ন করলেন :

"কিন্তু ইন্দু—এক বার ভেবে দেখেছ কি, সেই সর্বনাশা অস্ত্র হাতে পাবার পরে সেই হতভাগার অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছে? বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের মনের গুহ্যাতিগুহ্য কথাটাও সে

এখন জানতে পারছে। ফলটা কি দাঁড়িয়েছে, ভেবে দেখেছ কি? এই বয়সে তার চোখে এতটুকু রঙ নেই, কাউকে সে আপন জন ভাবতে পারে না, কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারবে না। কোনও অবলম্বন তার রইল না এই দুনিয়ায়। সান্ত্বনা পাবার আশায় কারও কাছে যাবে না। কারণ সে সকলের মনের অন্ধি-সন্ধির খবর পাচ্ছে। বল, এর পর সে কি সম্বল করে বেঁচে থাকবে?"

বোবা হয়ে গেলেন ইন্দুমতী। এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন রুদ্রমশায়ের দিকে, যেন খাঁচা ছেড়ে গেছে তার প্রাণপক্ষী।

এতক্ষণ পরে কথা বললে কল্যাণ। নিজস্ব ঢঙে নিজস্ব সুরে বলে উঠল :

"যাক বাবা, এক দিক থেকে তো নিশ্চিন্ত যে সে ভদ্রলোককে আর কেউ ঠকাতে পারবে না।"

প্রধানজী মুখ তুললেন। কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললেন :

"কিন্তু সেই জিনিসটা যদি সে আবার হারিয়ে ফেলে! কেউ যদি কোনও ফাঁকে সেটা চুরি করে নিয়ে পালায়!"

ভয়ানক চমকে উঠলেন রুদ্রমশাই। ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন :

"তাই তো!"

কল্যাণ বললে :

"চুরি যদি যায়, তা হলে লোকের মন জানবার ক্ষমতাও তাঁর যাবে। কিন্তু লোকের মন যখন তিনি জানতেই পারছেন, তখন চোরের মনও জানতে পারবেন। কাজেই চুরি কিছুতেই হবে না।"

গুলাব প্রধান একটু নড়েচড়ে উঠলেন। খুবই হালকা সুরে বলতে লাগলেন :

"তা হলে একটা গল্প শুনুন কল্যাণ-ভাই। অমন জিনিসও যে চুরি করা যেতে পারে, তার নজির দিচ্ছি শুনুন। অনেকদিন আগে, তখন ইংরেজ ছিল এই দেশের মালিক। ইংরেজে আর নেপালের

রাজ্যায় আইন বানিয়েছিল, ভারতের লোক বিনা হুকুমে নেপালে ঢুকতে পাবে না। শিবরাত্রের সময় যত যাত্রী যেত নেপালে তার হিসেব থাকত। শিবরাত্রের পর সকলকে নেপাল ছেড়ে চলে আসতে হত। এক বার একটি বাঙালী ছেলে শিবরাত্রের সময় নেপালে গিয়ে ঢোকে। নেপালী একটি ছোকরার সঙ্গে তার খুবই ভাব হয়। বাঙালী ছোকরাটি তার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সে নেপালী বন্ধুর কাছে আশ্রয় চায়। সে সময় নেপালের এক মঠে ভয়ানক নামকরা এক মোহন্ত মহারাজ ছিলেন। অদ্ভুত শক্তি ছিল তাঁর। নেপালের রাজাও তাঁকে সম্মান করতেন সেই শক্তির দরুন। নেপালী ছোকরাটির বংশের গুরু ছিলেন তিনি। ছোকরা তাঁকেই ধরল, বাঙালী বন্ধুকে মঠে লুকিয়ে রাখতে হবে। আশ্রয় পেয়েছিল সেই বাঙালী ছেলেটি। হঠাৎ এক দিন তাকে মঠের ভেতর খুঁজে পাওয়া গেল না। লুকিয়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বলে বেশী হৈ-চৈ করাও গেল না। তার পর এক দিন সেই মোহন্ত মহারাজ পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে বাগমতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—”

দমফাটা চিৎকার করে উঠলেন রুদ্রমশাই :

“ঝাঁপিয়ে পড়ে—”

গুলাব প্রধান কিন্তু একটুও উত্তেজিত হলেন না। একই সুরে একই টানে তাঁর গল্প শেষ করলেন :

“কোথায় যে ভেসে গেলেন, তা কেউ জানতেও পারল না।”

রুদ্রমশাই আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন আগের মত সামনে ঝুঁকে, দু হাত পেছনে দিয়ে। কল্যাণ বাঁকা চোখে দেখতে লাগল রুদ্রমশায়ের হাঁটার ধরনটা। প্রধানজী পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন দরজার দিকে। ইন্দুমতী খুব লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপিচুপি উচ্চারণ করলেন :

“খুঁজে বার করব তাকে। ধরে ফেলব, কেড়ে নেব সে জিনিস

তার হাত থেকে। দশ মাস দশ দিন তাকে পেটে ধরেছি। কোথায় সে লুকিয়ে থাকবে আমাকে ফাঁকি দিয়ে।"

প্রধানজী তখন দরজার ওপারে এক পা দিয়েছেন। চিৎকার করে উঠলেন আবার রুদ্রমশাই :

"গল্পের শেষটুকু না বলেই যে চলে যাচ্ছ গুলাব ? তার পর কি হল, বলে গেলে না ?"

মুখ ফেরালেন প্রধানজী। রহস্যময় এক জাতের হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। বললেন :

"তার পর এত দিন বাদে মোহন্ত মহারাজের শক্তিটা সার্থক-ভাবে কাজে লাগছে। রাজা, রাজপরিবারের মানুষদের কাছ থেকে বেশী করে প্রণামী আদায় করতেন মোহন্ত তাঁর শক্তি দেখিয়ে। এখন সেই শক্তিতে দেশ থেকে ঘুষ ভেজাল ধরাধরি লোপ পেতে বসেছে। এর থেকে আনন্দের কথা আর কি আছে রুদ্রজী ?"

"কিন্তু সেই চুরিটা, মোহন্তের হাত থেকে কে নিয়ে গেল সেই শক্তি কেড়ে—"

আকুল কণ্ঠে এইটুকুই বলতে পারলেন রুদ্রমশাই।

প্রধানজী এবার সত্যিই অকপট হাসি হেসে ফেললেন। বললেন :

"তার পরেও তো আবার চুরি হল। ভাবীজী এবার ভাবুন শেষটুকু। যাই আমি, একখানা চৌকি পাঠিয়ে দিই গিয়ে এই ঘরে।"

তিনি অদৃশ্য হলেন। কল্যাণও ঘর ছেড়ে চলে গেল। বলতে বলতে গেল :

"যাক বাবা, এখন স্পষ্ট জানা গেল সেই বৈজ্ঞানিকটি কে।"

ওঁরা স্বামী স্ত্রী আর পরস্পরের দিকে তাকাতেও পারলেন না। দু জনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীমতী ভাস্বতী দেবীর নৃত্য, শ্রীমতী হিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত। পরিচালনা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ।

সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল ঝড়ের মুখে আগুনের মত। আহা—কি সংবাদ! যাকে বলে দানসাগর শ্রাদ্ধ। নাচ গান আর স্ফূর্তি। চুমকুড়ি দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন অনেকে। তৎক্ষণাৎ মূল্যবান মস্তিষ্ক থেকে মহামূল্য সব মতলব ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে পড়ল। জুতসই একটা নাম চাই আগে। একটি গালভরা নামের সম্মেলন, কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে গুরুতর রকমের গবেষণার প্রয়াস। ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা আন্তর্জাতিক আদার রস মেশাতে পারলে আরও উত্তম হয়, যদি অবশ্য তেমন ডাকসাইটে এক সভাপতি আর হুঁদে এক প্রধান অতিথি যোগাড় করা সম্ভব হয়। অকস্মাৎ দার্জিলিং পাহাড়ে গণ্ডা দশেক এমন আড্ডা গজিয়ে উঠল যাঁরা কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রত্যেক আড্ডা থেকে আর্তনাদ উঠল, তাঁরাই সর্বপ্রথম সম্মেলনটি করবার সুযোগ নেবেন। হক আছে প্রত্যেকের, হক যে আছে তা প্রমাণ করার জন্যে সবাই পাল্লা দিয়ে হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন। যা-তা ব্যাপার তো নয়, স্বনামধন্যা দুই শিল্পী, নামের ওজনেই দাম, এত দামের শিল্পী নিয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যের শ্রাদ্ধ করার সুযোগ মেলা দার্জিলিঙের মত স্থানে কি যা-তা ব্যাপার নাকি? এ সুযোগ একটি বারই আসে, আর সেই একটি বারকেই বাগিয়ে ধরতে না পারলে চিরকাল আপসোস করে মর। সুযোগটি যাতে না ফসকায়, সে জন্য সমস্ত দার্জিলিং সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

দাঁড়িয়ে উঠল এবং দাঁড়িয়েই রইল। বাজারে স্টেশনে ম্যালে,

প্রত্যেকটি প্রকাশ্য স্থানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত-দর্শন সব ছবির দিকে। দেওয়ালে সাঁটা হয়ে গেল ছবি, প্রায় আস্ত মানুষের মাপের ছবি। যাঁরা সমঝদার মানুষ তাঁরা দেখা-মাত্রই চিনতে পারলেন। ঠিক মিলে যাচ্ছে, হুবহু সেই আদিম যুগের পাথরের মন্দিরের গায়ের পাথুরে মূর্তির মত ভঙ্গিমা। এরই নাম হল নিখুঁত কলা, একেবারে সেই—

"উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।"

কিন্তু ছবির তলায় যে ঘোষণাটি লেখা রয়েছে, তা পড়ে সকলের মাথা ঘুরে গেল। ফলে—

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

রক্তধারা আর কতক্ষণ না নেচে থাকতে পারে! সংস্কৃতি কৃষ্টি ঐতিহ্যের নাগালের বাইরে সেই সুরসভাতলে উর্বশী 'পুলকে উল্লসি' নৃত্য করবেন। ছবির তলায় স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে, নৃত্য-গীতের আসর বসবে সেই গৌরীশৃঙ্গ হোটেলে। প্রবেশমূল্যের পরিমাণ যা লেখা রয়েছে, তা সুরশ্রেষ্ঠদেরই উপযুক্ত। তা ছাড়া মূল্য জুটলেও প্রবেশপত্র জোটানো রামা-শ্যামার কর্ম নয়। সুতরাং রাস্তায় দেওয়ালে-সাঁটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা ছাড়া আর কারও কিছু করার রইল না। খামকা ক্ষুব্ধ আক্রোশে বক্ষোমাঝে রক্তধারা নৃত্য করতে লাগল।

শ্রীমতী ভাস্বতী দেবীর অলৌকিক নৃত্য দেখার আর শ্রীমতী হিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্নরী-কণ্ঠ শোনার উপযুক্ত মানুষ যাঁরা, তাঁরা সর্বসাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মিসেস্ আতুরী চৌধুরীর অশরণ অলীক ভিলায় ভিড় জমিয়ে তুললেন। শিল্পীদের অভিনন্দিত করে নিজেদের সূক্ষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় দেওয়াটা উঁচু সমাজের একটি শিষ্টাচার। অনেকে আচার পালন করেই ফিরে গেলেন, অনেকে

আচার পালন করার পরেও ফিরতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে বেছে বেছে উপযুক্ত কয়েক জনকে মিসেস্ চৌধুরী একটু বেশী রকম বিশ্বাস করে ফেললেন। অতঃপর পাঁচজন ধীমান ধীমতী এক সঙ্গে জুটলে যা হয়, তাই হল। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্র এসে গেল। সকন্যা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ পেয়িং-গেস্ট হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন মিসেস্ চৌধুরীর ভিলায়। তিনিও সেই সমস্ত উঁচুদরের আলোচনায় যোগ না দিয়ে পারলেন না। ওধারে গৌরীশৃঙ্গ পান্থশালার সুবিশাল জলসা-ঘরে উৎসবায়োজন পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলল। প্রথম রজনী সমাসন্ন।

শ্রীশান্তনু রুদ্রকেই প্রথম রজনীর সভাপতি করার জন্যে পছন্দ করা হল। এক সময় তো লোকটার খুবই নাম-ডাক ছিল। দার্জিলিঙের মত স্থানে আরও বেশী নামডাকওয়ালা মানুষ খপ করে জোটানোও যে শক্ত। পণ্ডিতজীর আগ্রহেই রুদ্রমশায়কে সভাপতি করার প্রস্তাবটা সকলে মেনে নিলেন। পণ্ডিতজীর ওপরেই ভার দেওয়া হল রুদ্রমশায়কে আমন্ত্রণ জানাবার। রুদ্রমশায় কিন্তু কিছুতেই সভাপতি হতে রাজী হলেন না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে পণ্ডিতজী বন্ধুকে এনে ফেললেন মিসেস্ চৌধুরীর ড্রইংরুমে। দেখা যাক, অতগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার অনুরোধ রুদ্রমশায় এড়িয়ে যান কেমন করে।

মিসেস্ আতুরী চৌধুরীর অশরণ অলীক ভিলার ড্রইংরুম। একটি বার যেখানে পদার্পণ করলেই বোঝা যায়, ড্রইংরুম সাজাবার আসবাবপত্র পছন্দ করার জন্যে কতখানি সূক্ষ্ম রুচির প্রয়োজন। শুধু রুচি নয়, উপযুক্ত সামর্থ্য আর অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। কোন্ মুল্লুকে কোন্ আজগুবি সামগ্রীটি সবেমাত্র বাজারে বার হল, সে সংবাদও রাখতে হবে। এতগুলি জ্ঞান শক্তি সামর্থ্য একসঙ্গে মালিকের মগজে জমা না হলে অত রকমের বেয়াড়া জিনিস জুটিয়ে ড্রইংরুমে গাদা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বন্ধুর পরামর্শ মত যথেষ্ট সভ্যভব্য হয়ে এলেন রুদ্রমশাই। মটকা পাঞ্জাবির ওপর মহামূল্যবান কাশ্মিরী শাল জড়িয়ে সভা-পতির উপযুক্ত সাজে এলেন। আদবকায়দা মাফিক অভ্যর্থনা করার জন্যে মিসেস্ চৌধুরী প্রস্তুত হয়ে বসে ছিলেন ড্রইংরুমে। ভাস্বতী আর হিয়া তখনও তৈরী হয়ে পৌঁছতে পারে নি। পণ্ডিতজী বন্ধুকে এনে দাঁড় করালেন ড্রইংরুমের ভেতরে। অদ্ভুত রঙের পর্দাখানা পেরিয়েই তাজ্জব বনে গেলেন রুদ্রমশাই। ঘরখানার চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আসবাবপত্র দেখতে লাগলেন। গৃহকর্ত্রী মানানসই হাসি-মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে, সেদিকে তাঁর নজরই পড়ল না। বন্ধুর দিকে ফিরে বোকার মত বলে বসলেন ঃ

"এ আমায় নিয়ে এলে কোথায় নীলকণ্ঠ! এটা কি দার্জিলিঙের জাদুঘর নাকি!"

আচমকা অদ্ভুত কথা শুনলে মানুষ হকচকিয়ে যায়-ই। পণ্ডিতজী বেসামাল হয়ে পড়লেন ঃ

"জাদুঘর! মানে মিউজিয়ম! মানে—!"

মানে ঠিক করতে গিয়ে কথা আটকে গেল তাঁর।

"মানে—সংগ্রহশালা, বা আজব-ঘরও বলতে পার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে যা আজগুবী চিজ মেলে, সব জুটিয়ে যেখানে জমা করা।"

মানেটা একান্ত সোজা ভাষায় বাতলালেন রুদ্রমশাই। তার পর তাঁর নজর পড়ল মিসেস্ আদুরী চৌধুরীর ওপর। মিউজিয়মের বিশিষ্ট দ্রব্য হিসেবে তাঁকেও তিনি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

ফাঁপরে পড়ে গেলেন পণ্ডিতজী। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ঃ

"এই যে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই শান্তনু।—ইনিই হলেন মিসেস্ চৌধুরী। শ্রীমতী আদুরী চৌধুরী। এঁরই এই কটেজ, আমার ছোটবেলার বন্ধু ইনি, এঁর কাছেই আমরা আছি।"

রুদ্রমশাই নেহাতই অন্যমনস্ক ভাবে বললেন :

"নমস্কার, নমস্কার। বেশ তো সাজিয়েছেন ঘরখানিকে, নিজের মত করে সাজিয়েছেন একেবারে। আপনার পছন্দ আছে।"

মিসেস্ চৌধুরী এতক্ষণ ঠিক ধরতে পারছিলেন না রুদ্রমশায়ের কথাবার্তার ধরন। এবার যেন একটু পারলেন। ওজন-মাফিক হাসিতে একটু বেঁকে গেল তার মুখ, বললেন :

"না না, তেমন আর কি। পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবে পাঁচ রকম প্রেজেন্ট করেছেন। তাই দিয়েই কোনও রকমে—"

"এ্যাঁ! বলেন কি! সবই বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া!"

অকপট বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন রুদ্রমশাই। কয়েক মুহূর্ত মিসেস্ চৌধুরীর মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন :

"হিংসে হয় আপনার বন্ধুভাগ্য দেখে। বন্ধু-স্থানে নিশ্চয়ই বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি রয়েছে।"

বিগলিত হলেন মিসেস্ চৌধুরী, রুদ্রমশায়ের আলাপ করার কায়দাটিকে মনে মনে তারিফ করলেন। বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি আছে, এত বড় প্রশংসা কেউ কখনও আর করেছে কি না ঠিক স্মরণ করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন :

"কে আর এ সব জিনিস বোঝে বলুন। ঘর-সাজানোর মধ্যেও যে একটা সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনেকে জানেই না। হামেশা তো আপনার মত গুণীজনের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে না।"

রুদ্রমশায় তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন মিসেস্ চৌধুরীর মন্তব্য। বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন :

"যা বললেন, একদম আসল কথাটি বলে ফেললেন। শুধু শুধু বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো। তাই তো আমি বলি গিন্নীকে, তক্তাপোশ পাতো, তার ওপর মাদুর বিছিয়ে দাও। আর খুব বেশী যদি দিতে চাও, দাও দু-চারটে গোলগাল তাকিয়া। এখানে এই শীতের দেশে

অবশ্য মাদুর চলবে না, মোটা গদি চাই, গরম কম্বল হলে আরও ভাল হয়। খামকা ঘর সাজিয়ে লাভ কি ? সাজানোর মূল্য বুঝবে কে ? বোঝবার মানুষ আছে কটা এই তুনিয়ায় ?”

জুতসই আরও কয়েকটা কথা বলতেন রুদ্রমশাই। পারলেন না, থেমে যেতে হল। একে একে বোঝবার মানুষরা ঘরে প্রবেশ করতে লাগলেন।

মুহূর্তমধ্যে ঘরের আবহাওয়াই একেবারে পালটে গেল। অস্বাভাবিক সুরে, কৃত্রিম আন্তরিকতায়, কপট হাসিতে জমজমাট কাণ্ড বেধে গেল ঘরের মধ্যে।

এক ধাক্কায় বয়সটাকে অনেক নীচের তলায় নামিয়ে ফেললেন মিসেস্ চৌধুরী। কেমন এক বিচিত্র আওয়াজ বার করলেন গলা থেকে—হা ডু ডু, হা ডু ডু, হা ডু ডু। প্রত্যেকের হাতের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে হা ডু ডু খেলা খেললেন। এক মুখে পঞ্চাশ মুখের কাজ করতে লাগলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রুদ্রমশায়ের।

“ইনি দি গ্রেট অথর অফ আওয়ার এজ মিস্টার রুদ্র, ইনি হলেন খাগড়াজোলের দি গ্রেট প্রিন্স। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, একশটার বেশী ম্যান-ঈটার হিট করেছেন। কখনও এঁর টারগেট মিস হয় না। আর ইনি লর্ড অফ মিয়েরবেড়। ইনি মোটর রেসে এবার অলিম্পিক রেকর্ড ছুঁয়েছেন। ইনি মিসেস্ সিন্‌হা, নাগা হিলস নিয়ে রিসার্চ করছেন এর স্বামী। আর ইনি মিস্টার মালহোত্রা, এঁর স্ত্রী এবার বিউটি কনটেস্টে প্রাইজ পেয়ে হলিউড গেছেন। আর ইনি—”

“হয়েছে, হয়েছে, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিচ্ছি।”

বলে থামালেন রুদ্রমশাই মিসেস্ চৌধুরীকে। ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণের দিকে চেয়ে তু হাত জোড় করে বললেন ঃ

"কি সৌভাগ্য, আপনাদের মত মান্যগণ্য মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ পেলাম আজ। মিসেস্ চৌধুরীর মত উচ্চমনা মহিলা দার্জিলিঙে আছেন বলেই না এটা সম্ভব হল! আর আমার এই বন্ধুটি, যেমন বড় দরের গাইয়ে, তেমনি বড় দরের প্রাণ। ওঁর দয়াতেই মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়টা ঘটল।"

থাবা বাড়িয়ে দিলেন খাগড়াজোল, একশটার বেশী ম্যান-ঈটার যিনি হিট করেছেন। থাবার মত থাবা বটে। একশটা ম্যান-ঈটার তো অতি তুচ্ছ কথা, ঐ জাতের থাবা দিয়ে থাবড়ে হাজারটা গণ্ডার মারাও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অপাঙ্গে থাবাটি দর্শন করে নিজের হাত নামাতে সাহস হল না আর রুদ্রমশায়ের। মুখের হাসি বজায় রেখে হাত জোড় করেই বলে উঠলেন ঃ

"চলুন চলুন, এবার আমরা বসে আলাপ-পরিচয় করি। মিসেস্ চৌধুরীর এমন চমৎকার ড্রইংরুমে কিছু সময় কাটাতে পারলেও ত্বনিয়াটা সম্বন্ধে খানিক ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। তার ওপর আপনাদের মতন জ্ঞানী-গুণী মানুষদের সঙ্গ, এ সুযোগ কি সহজে মেলে। শিকারের গল্পই শোনা যাক, আপনার মত স্বনামধন্য শিকারীকে যখন পাওয়া গেছে—"

খাগড়াজোল কৃতার্থ হয়ে পড়লেন, থাবা নামিয়ে নিয়ে ওভার-কোটের বোতাম সাইজের ছ জোড়া দাঁত বার করে ফেললেন। দন্ত দর্শন করে আর রা বেরোল না রুদ্রমশায়ের মুখ থেকে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন এক কোণের একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে। মিসেস্ চৌধুরী আসন গ্রহণ করবার জন্যে খাঁটি বিদেশী কায়দায় সকলকে অনুরোধ জানালেন ঃ

"আরে তাই তো! হাউ ইজ ইট, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি যে! আসুন, বসে পড়া যাক এবার।"

বসে পড়ার কথাটা মনে পড়াতে সবাই বসে পড়লেন। পণ্ডিত

নীলকণ্ঠ শুধু বসলেন না। এক পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন। ফাঁক পেয়েই আরম্ভ করলেন :

"আসল কথাটা আগে আমি বলে নিই তা হলে। শিকারের গল্প শুরু হলে হয়তো কথাটা বলাই হবে না। আপনাদের অনুরোধ আমি জানিয়েছি আমার বন্ধুটিকে। উনি কিন্তু রাজী নন। শেষে কোনও রকমে এনে ফেলেছি আপনাদের কাছে। এবার আপনারা—"

এক জোটে সব ক'জন নারী পুরুষ আকাশ থেকে পড়লেন। প্রত্যেকেই ভয়ানক আশ্চর্য হবার ভান করে নানারকমের আশ্চর্য-জনক বাক্য উচ্চারণ করে ফেললেন।

"সে কি! তাই না কি! মাই গ্যড! স্ট্রেঞ্জ! ইম্‌পোসিবল্!" ইত্যাদি দেশী বিদেশী আওয়াজ তুলে সকলে একযোগে তাকালেন রুদ্রমশায়ের দিকে। রুদ্রমশায় বিন্দুমাত্রও অপ্রস্তুত হলেন না। তিনিও যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন :

"তাজ্জব ব্যাপার না! বলুন, আপনারাই বলুন। কোথাও কিছু নেই, সভাপতি হতে হবে। নাচ গান হবে, টিকিট কিনে সকলে দেখবে শুনবে। এর মধ্যে সভাপতি এক জন করবেন কি? নাচ-গান নিয়ে নিশ্চয় বিচার-সভা বসছে না, কিংবা নাচ-গান সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠও হবে না—নাচ-গানের জলসায় এক জন সভাপতি প্রয়োজন।...ব্যাপারটা ঠিক মগজে ঢুকছে না যে—"

সর্বপ্রথম মিসেস্ চৌধুরীই চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা সঠিকভাবে বোঝাতে রুদ্রমশাইকে। বললেন :

"শুধু তো নাচ-গানই নয়। কাল্‌চারল্ ফাংশানে নাচ-গান একটু থাকেই। ওটা শেষের ব্যাপার। তার আগে আমরা কিছু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে। এই যে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য আজ গোল্লায় যেতে বসেছে—"

"এগ্ জ্যাক্টলি !"

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন খাগড়াজোল প্রিন্স। একথান পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাতের গরম কাপড়ের তৈরী কোট প্যান্ট আচ্ছাদিত লাসখানিকে তাঁর তৎক্ষণাৎ খাড়া করে ফেললেন। তুই বিশাল থাবায় ঘষাঘষি করতে করতে এক পা এগিয়ে গেলেন রুদ্রমশায়ের দিকে। তারপর আর একটি হুংকার ছাড়লেন :

"এগ্ জ্যাক্টলি, ভেবেছে কি ওরা আমাদের ? মুখ বুজে মার খেতে হবে ? ভোট দিয়ে যাদের আমরা গাছে তুলে দিয়েছি, তারা গাছের ওপর বসে আমাদের মাথার ওপর কাঁঠাল আছড়ে ভাঙবে ? এর কি কোনও প্রতিকার নেই ? এই দেশ, এই জাতি,—আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই দেশের কাছে ? জাতি আজ ভুলে যেতে বসেছে সব কিছু, কিন্তু চৈতন্য বুদ্ধ তুলসীদাস কি এই দেশে জন্মায় নি ? সব ভুলে গিয়ে সমস্ত জাতটা রক্তের নেশায় মেতে উঠেছে। আর আমরা চুপ করে থাকব ?"

অত্যন্ত অহিংস বক্তৃতা, বক্তৃতার শেষে এমন চোখে তিনি তাকালেন সকলের মুখ পানে যে অনেকের ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম হল। হঠাৎ কেউ কিছু বলতে সাহস করল না। খাগড়াজোল তাঁর ভয়ঙ্কর-দর্শন মূর্তিটিকে আবার আসনে স্থাপন করলেন।

উঠে দাঁড়ালেন লর্ড অফ মিয়েরবেড়, যিনি মোটর রেসে অলিম্পিক রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। লম্বা পাড়ি জমাবার উপযুক্ত লম্বা মানুষ হলেন মিয়েরবেড় লর্ড। মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা ওঁকে বানাবার সময় ভুলেই গিয়েছিলেন মাথাটি বসাতে ওঁর কাঁধের ওপর। মুণ্ড ছাড়া প্রমাণ মাপের মানুষ একটি তৈরী করে যখন ধরতে পারলেন তিনি নিজের ভুলটা, তখন তাড়াতাড়ি একটা মাথা জুড়ে দিলেন প্রমাণ মাপের ধড়টির ডগায়। ফলে থুতনি থেকে তালু পর্যন্ত অংশটা বাড়তি হয়ে গেছে। লক্ষ মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও থুতনি থেকে তালু সকলের নজরে পড়বে। মিয়েরবেড়

যখন কথা বলেন, তখন সেটাকে আকাশবাণী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আকাশের কাছাকাছি স্থানে থাকে তাঁর মুখ। আকাশবাণীর চণ্ডী-পাঠকের মত বীর-রসাত্মক গলা তাঁর। আরম্ভ করলেন মিয়েরবেড় লর্ড ঃ

"আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হচ্ছে, বিষ খাওয়া, গলায় দড়ি দেওয়া, নিজের কপালে পিস্তলের মুখ চেপে ধরে ফায়ার করা, পাহাড় থেকে গাড়িসুদ্ধ খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, নিজের বুকে নিজের হাতে ছুরি বসানো। কলকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ, সব জায়গা থেকে এক জাতের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সমাজের যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ, কালও যাঁদের নামে সারা দেশ কেঁপে উঠত, তাঁরা আজ কোথায়? বড় বড় রাষ্ট্রনেতা, দক্ষিণপন্থী বামপন্থী উদারপন্থী, বড় বড় বিজনেসম্যান, নামকরা সব কনট্রাকটর যাঁরা কোটি কোটি টাকার বিজনেস করেছেন আমাদের দেশের ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানগুলো সার্থক করে তোলবার জন্যে, আর ওধারে গভর্নমেণ্টের চাঁই চাঁই অফিসাররা, যাঁরা পরিকল্পনা করতে এক্সপার্ট, সব সুইসাইড করে বেইজ্জত হওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন।"

"এণ্ড হোয়াই?"

শান-বাঁধানো মেঝের ওপর খাগড়াই বগি থালা একখানা আছড়ে পড়ল যেন। যেদিক থেকে উঠল আওয়াজটা, সবাই সেদিকে সচকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। এক মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছেন। মোষের রক্তের মত লাল সজ্জায় সজ্জিতা তিনি। পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল-সবই লালে লাল। মেয়েদের বয়েস আন্দাজ করা নিষেধ, নয়ত এ কথা বললে অন্যায় হয় না যে তিনি পঁচিশ পার হন নি তখনও। সকলের নজর তাঁর ওপর পড়েছে বুঝতে পেরে মহিলাটি শানের ওপর থালা-আছড়ানো সুরে দমকে দমকে বলতে লাগলেন ঃ

"এণ্ড হোয়াই? আমি জানতে চাচ্ছি, এই সমস্ত অশান্তির মূল

কি ? কোথাকার কে, একটা ঠক্ জোচ্চর বুজরুক হঠাৎ রটাতে শুরু করলে যে সে মনের ছবি তুলতে পারে। ব্যাস, দেশসুদ্ধ মানুষ তার কথা বিশ্বাস করলে। অমনি আইন বানানো হল। যা হক একটা বিচারের ভণিতা করে রাস্তার কুকুরদের মুখে ভদ্র-লোকদের ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর এই আত্মহত্যার হিড়িক। হোয়ার ইজ দ্যাট্ শয়তান ? লেট হিম্ কাম বিফোর মি। আমি দেখতে চাই, কেমন সে মনের ছবি তুলতে পারে।"

দম আটকে গেল মহিলাটির, দুই চোখের আগুনের শিষ দিয়ে তিনি আর একবার প্রত্যেকের মুখ লেহন করলেন।

গুড়গুড় করে এগিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন হোদল-কুৎকুৎ প্যাটার্নের এক সাহেব। দাঁড়িয়েই চোখ বুজে ওপর দিকে মুখ তুলে আওয়াজ বার করলেন তাঁর গলা থেকে। মুখের মধ্যে খানিকটা লালা নিয়ে যেন কথা বলেন তিনি। তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন :

"হে পরম করুণাময়, পরম দয়াল পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় আমরা যেন শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার পাই। ঘোর বিপাকে পড়ে পাপীরা খাবি খাচ্চে, তুমি তাদের উদ্ধার কর প্রভু। এই পাপীরা জানে না, তারা কি করছে। এই পাপীরা তোমাকে পাপ দান করে পরিশুদ্ধ হোক—আমেন।"

প্রার্থনা সমাপ্ত করে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন চোখ বুজে।

লাফিয়ে উঠলেন আর এক ভদ্রলোক। ইনি ধুতি-চাদর মণ্ডিত। সোনার ফ্রেমের চশমা, ছুঁচলো দাড়ি ছুঁচলো কপাল, সমস্ত মিলিয়ে মুখখানি বেশ চালাক-চতুর গোছের। ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাঁচির সুরে কথা বলেন ইনি, কথাগুলো যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারেন সকলের মুখের ওপর। আরম্ভ করলেন ছুঁচোমুখো ভদ্রলোক :

"পাপ ? হুঁঃ—যত সব—ইয়ে। পাপ এণ্ড পুণ্য—হুঁঃ—যত সব—ইয়ে। তফাতটা কি শুনতে চাই—হুঁঃ। আজ যেটা পাপ

কাল সেটা পুণ্য, আজ যেটা পুণ্য কাল সেটা পাপ। পাপ পুণ্যের হিসটোরী কেউ জানে? এখানে মানুষ মারা পাপ, আফ্রিকায় মানুষ খাওয়াও পাপ না। দি ওন্‌লি পাপ আই নো, মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া। যার যা খুশি করুক, তুমি বাধা দেবার কে? বাধা বাধা আর বাধা, নিষেধ নিষেধ আর নিষেধ—হুঁ—যত সব—! আইন আফটার আইন বানিয়ে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা মনুষ্যত্বের পূজারী, উই পিপ্‌ল্ বিলিভ যে পাপ পুণ্য সব বোগাস আইডিয়া। মনুষ্যত্বের মৌলিক সংস্কারতন্ত্রী এক হও। ইন্‌ক্লাব মনুষ্যত্ববাদ।"

সজোরে তিনবার 'ইন্‌ক্লাব মনুষ্যত্ববাদ' ছুঁড়ে মেরে তিনি নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

সর্বশেষে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার মালহোত্রা, যাঁর স্ত্রী বিউটী-কনটেস্টে প্রাইজ পেয়ে হলিউড গেছেন। ভদ্রলোক নিজে কোনও বিউটী কন্‌টেস্টে নামলেও নিশ্চয়ই প্রাইজ পেতেন। যেমন রঙ তেমনি রূপ, সর্ব অবয়ব এমন নিখুঁত ধরনের যে ভাস্করের নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ ওকে দেখে পাথর খোদাতে বসে যাবে। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্ট পরে আছেন তিনি। নিজের রঙের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যেই বোধ হয় গোলাপী আভার ধূসর রঙ পছন্দ করেছেন। চোখের দৃষ্টিতে অনাবিল নিশ্চিন্তুতা ঘুমিয়ে রয়েছে—গলার স্বরে রাগ দ্বেষ বিষন্নতার ছিটেফোঁটাও ধরা পড়ে না। সত্যিকারের বনেদী আমেজ ফুটে উঠল তাঁর কথা বলার ধরনে। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলার মত করে বলতে লাগলেন:

"ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ, সামান্য দু'চারটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই। আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না।"

এইটুকু বলে থামলেন মিস্টার মালহোত্রা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ বিরক্ত হলেন কি না। চারিদিকে তাকাতে গিয়ে দরজার ওপর তাঁর নজর আটকে গেল। সামান্য একটু হাসি ফুটে

উঠল তাঁর মুখে, সামান্য একটু নুয়ে কাকে যেন তিনি সাদর আহ্বান জানালেন। তারপর আবার শুরু করে দিলেন তাঁর ভাষণ :

"আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করার বাসনা নিয়ে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুন্দরের সাধনায় মানুষ এ-হেন সিদ্ধিলাভ করেছে যে সে অবহেলায় পশুত্বকে পরাস্ত করতে পারে, এইটুকুই আমরা প্রমাণ করতে চাই। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা এমন দু'জন শিল্পীকে পাচ্ছি যাঁদের শক্তি সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীমতী ভাস্বতী এবং শ্রীমতী হিয়া —এঁরা দু'জনেই বিশ্বাস করেন, নৃত্য-গীত-বাদ্যের এমন শক্তি আছে যে হিংসার সাহায্য না নিয়েও পশুকে মানুষ করা যায়। আমরাও তা' বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছি আমরা। দেশে একটা গোলমাল চলছে, অমানুষিক এক আইন বানিয়েছেন দেশের সরকার, বহু লোক এই আইনের ভয়ে আত্মহত্যা করে ফেলছেন। আমরা ঐ আইনের সমালোচনা করার জন্যে এই অনুষ্ঠান করছি না। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই, ঐ আইনের সাহায্য না নিয়েও দুর্নীতি দমন করা যায়। শুধু দমন নয়, দুর্নীতি কথাটাকেই উঠিয়ে দেওয়া যায় দুনিয়ার অভিধান থেকে। আমরা বিশ্বাস করি, হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে মানুষের লোভকে পরাভূত করা যায় না। সুন্দরের পূজারী মানুষ, মানুষের মনের সামনে সুন্দরের স্বর্গদ্বার খুলে দাও, মানুষ তৎক্ষণাৎ তার আপন সত্তা ফিরে পাবে। এই যে লোভ দুর্নীতি নীচতা, যার দাপটে দিশাহারা হয়ে রাষ্ট্রনেতারা অতি ঘৃণ্য ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন, যার ফলে সমস্ত জাতটাই হয়তো একদিন হানাহানি করে লোপ পাবে, সেই লোভকে দুর্নীতিকে নীচতাকে আমরা সুন্দরের সাধনা দ্বারা দূর করব। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই অনুষ্ঠান।"

এই পর্যন্ত বলে মিস্টার মালহোত্রা থামলেন। তাঁর ভাষণটি শ্রোতাদের মনের ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করল, তাই বোঝবার জন্যেই বোধ হয় একবার দৃষ্টি ফেরালেন চতুর্দিকে। রুদ্রমশায়ের চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই রুদ্রমশাই বলে উঠলেন :

"সাধু সাধু সাধু" !

সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কায়দায় কয়েকজন একটু হাততালি দিলেন। ঘরের হিংস্র আবহাওয়াটা একটু হালকা হল। মিস্টার মালহোত্রা বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন, মাথা নিচু করে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর আসনে বসে পড়লেন।

এতক্ষণ পরে সকলের খেয়াল হ'ল, কোন ফাঁকে শিল্পী দু'জন ঘরে ঢুকে চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াল হ'ল রুদ্রমশায়ের ডাকে। খুবই ঘরোয়া ভাষায় তিনি ডাক দিলেন :

"এই যে গো মায়েরা, তোমরাও এসে পড়েছ দেখছি। এস এস, বসো এইখানে।"

ছোট একটি সোফা খালি ছিল তাঁর পাশে, সেইটি দেখিয়ে দিলেন। মেয়েরা এগিয়ে গেল। প্রথমে হিয়া তারপর ভাস্বতী নত হয়ে রুদ্রমশায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। রুদ্রমশাই অনুযোগের সুরে বলতে লাগলেন :

"একেবারে ভুলে গেলে মা বুড়ো ছেলেটাকে ? এই ক'দিন একটিবার ওমুখো হও নি, বন্ধুকে পেয়ে এমনিই মেতে উঠেছ ! ওধারে মায়ের গান না শুনতে পেয়ে শেষে হ্যাংলার মতো বুড়ো ছেলেকেই ছুটে আসতে হল মায়ের কাছে।"

কি যে ছিল রুদ্রমশায়ের সেই নেহাত মেঠো গোছের আমড়া-গাছির মধ্যে ! মিসেস্ চৌধুরীর অশরণ অলীক ভিলার ড্রইংরুমের পক্ষে একান্ত বেমানান সেই সুর অত্যাশ্চর্য ফল ফলিয়ে ছাড়ল। পোশাকী আদবকায়দা ভুলে গিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই অকপট অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন রুদ্রমশায়ের। প্রথমেই কথা বললেন মিসেস্ চৌধুরী :

"আদর তো করছেন মেয়েদের। ওরা একটু নাচ গান করবে, সেখানে একটু বসে থেকে ওদের সাহস দেবেন না কেন ?"

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্বতী বলে উঠল ঃ

"আজই আমরা পরামর্শ করেছি, দু'জনে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে আসব। দেখব, কি করে আপনি আমাদের তাড়িয়ে দেন।"

হিংস্র খাগড়াজোল প্রিন্স তাঁর অস্বাভাবিক গলাটাকে যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে নেহাত ছেলেমানুষের মত বলে ফেললেন ঃ

"হ্যাঁ, তাড়িয়ে অমনি দিলেই হল। আমরা তো আর কেউ নই ওঁর! উনি দূর-দূর করলে আমরা মানব কেন ? আমাদের সম্পত্তি উনি, এ পর্যন্ত যা লিখেছেন যা বলেছেন, সব আমাদের বুকের ভেতরের কথা। একেবারে আপনার জন না হলে, আমাদের মনের কথা উনি এত জানলেন কেমন করে ?"

রক্তবসনা সুন্দরী খ্যাঁক করে উঠলেন ঃ

"শুধু ঐ হিয়াই ওঁর নিজের মেয়ে, আমরা যেন কেউ নই! কি অবস্থায় আছি আমরা! দিনরাত বুক ঢিপঢিপ করছে। কার কাছে যাব আমরা, কে আমাদের একটু শান্তি দেবে!"

সত্যিই অভিমানে ভদ্রমহিলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন ঃ

"শোন শান্তনু, শোন। সভাপতি একটা চান না এঁরা, তোমায় চান। এঁরা চান সেই শান্তনু রুদ্রকে, যিনি এক সময় কলমের আঁচড়ে দেশসুদ্ধ নরনারীর হৃদয়ে নিজের স্থান এঁকে রেখেছেন। সাহস পেতে চান এঁরা, একটু আশ্বাস পেতে চান। একটু আলো দেখতে চান। অন্ধকার,—অন্ধকার হাঁ করে গিলতে আসছে, কে এখন আলো দেখাবে শান্তনু ? কে পথ দেখাবে ?"

আকুল আবেদন যাকে বলে। মস্ত বড় ধ্রুপদীর গলার কায়দায় আবেদনটি সাকার রূপ ধারণ করল যেন। অসাড় হয়ে সকলে তাকিয়ে রইলেন রুদ্রমশায়ের মুখের দিকে। কি বলবেন এবার

শান্তনু রুদ্র! রুদ্রমশায়ের একটি মুখের কথার ওপর যেন সকলের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।

বলতেনও হয়তো কিছু রুদ্রমশাই। গুছিয়ে কিছু বলবার জন্যে তিনি নতমুখে একটু চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল।

'দিস্ ইজ কাউয়ার্ডিস!"

ফ্যাঁচ্ করে উঠলেন ছুঁচলো দাড়িওয়ালা ছুঁচো-কপালে ভদ্রলোকটি। ছিট্‌কে উঠে চাদর সামলাতে সামলাতে বেরিয়েই চললেন তিনি ঘর ছেড়ে। দু' পা সামনে ফেলেন আবার পেছন ফিরে ফ্যাঁচ্ করে ওঠেন:

"ভীরুতা—হুঁ—যত সব—ইয়েঃ! জঘন্য ভীরুতা—হুঁঃ! অসহ্য, ইনটলারেব্‌ল্। নিজেদের অপরাধী ভাবার ফল এটা। এতটুকু সেন্স অফ ডিগ্‌নিটি নেই—ছোঃ—। একজন উদ্ধারকর্তা চাই-ই চাই। ননসেন্স—সেল্‌ফ্ কন্‌ফিডেন্স নেই—হুঁ—।"

ছেটকাতে ছেটকাতে পৌঁছে গেলেন তিনি দরজার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে তিনবার আওয়াজ তুললেন:

"ইনক্লাব মনুষ্যত্ববাদ, ইনক্লাব মনুষ্যত্ববাদ, ইনক্লাব—"

শেষ মনুষ্যত্ববাদটি উচ্চারণ করার আগেই তাকিয়ে ফেললেন দরজার দিকে।...সঙ্গে সঙ্গে কাঠ। কাষ্ঠবৎ তাকিয়ে রইলেন দরজার বাইরে। তারপর পিছোতে লাগলেন দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। যেন সাক্ষাৎ ভূত দেখতে পেয়েছেন, এমনি অবস্থা হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখের।

ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন, রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন সকলে দরজার দিকে। সাংঘাতিক গোছের কোনও কিছু নিশ্চয়ই ঢুকবে এসে ঘরে, নয়ত অমনভাবে ভয় পেলেন কেন বিদ্রোহী মানবাত্মার পূজারী! অবশেষে সকলকে নিরাশ করে দরজার ওপর উদয় হলেন যিনি, তাঁকে দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন সকলে। একটি মেয়ে, কম্বল-জড়ানো একটা কিছু জাপটে

ধরে আছে সে বুকের কাছে। মেয়েটির গায়ে শতছিন্ন হাতে-বোনা একখানি স্কার্ফ ছাড়া আর কিছুই নেই। দরজা পার হয়ে সে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। তারপর বুকের কাছে ধরা কম্বলে জড়ানো পদার্থটির দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল :

"করব কি আমি এখন একে নিয়ে?"

প্রশ্নটা যেন সে নিজেকেই করল। প্রশ্নটি করে মুখ তুলে কারও পানে তাকাল না।

ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়, এমনই নিস্তব্ধ হয়ে রইল ঘরখানা। একটি প্রাণী এতটুকু নড়তে পারলেন না।

কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে থেকে মুখ তুলে বিদ্রোহী মানবাত্মার পূজারীর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বলে উঠল :

"নাও, তোমার জিনিস তুমিই নাও। আমায় রেহাই দাও। একে নিয়ে তো আমি আত্মহত্যাও করতে পারব না।"

যাকে বলা হল, তিনি তখন আটকে গেছেন ঘরের দেওয়ালে। আর পিছোবার জায়গা নেই। ভীরুতা নয়, নিছক বোবা পশুর চাউনি ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে। পশুর চাউনি দিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন মেয়েটির পানে।

আর দু'পা এগিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি, দু'হাতে তুলে ধরে বাড়িয়ে ধরল হাতের সামগ্রীটিকে। আর একবার সে তাকাল সকলের মুখ পানে। তারপরে ঘাড় হেঁট করে, ভয়ানক সঙ্কুচিত কণ্ঠে আর একটি প্রশ্ন করল :

"নেবে না তা'হলে? তা'হলে এখন আমি কি করব একে নিয়ে? আজ সকালে ছাড়া পেয়েছি হাসপাতাল থেকে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে এখানে এসে তোমায় ধরতে পারলাম—"

অপরিসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল তার গলা। নিজেও হয়তো সে ভেঙে পড়ত, ছুটে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে ভাস্বতী!

চীৎকার করে উঠল হিয়া ঃ

"কেড়ে নে ভাস্বতী, কেড়ে নে বাচ্চাটাকে, দেখ্, এখনও বেঁচে আছে কি না।"

প্রিন্স অফ খাগড়াজোল এক লাফে গিয়ে তাঁর বিশাল থাবা দিয়ে মনুষ্যত্ববাদীর টুঁটি টিপে ধরলেন। মুহূর্ত মধ্যে ভয়ঙ্কর ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগলেন। খাগড়াজোলের হুংকার, মনুষ্যত্ববাদীর আঁ-আঁ নাকীস্বর, মিসেস্ চৌধুরীর বকাবকি, রক্তবসনা সুন্দরীর দু'হাত তুলে অভিশাপ দেওয়া, আকাশবাণীর যাচ্ছেতাই ভাষায় ধিক্কার দেওয়া, সমস্ত এক সঙ্গে মিলেমিশে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করল ঘরের মধ্যে। সেই হট্টগোলের মধ্যে ঝড়ের বেগে তিনটি প্রাণী ঘরে ঢুকল। দু'জন জঙ্গী জোয়ান, দু'জনের হাতেই ভীম-দর্শন আগ্নেয়াস্ত্র। একজনের শুধু হাত, মালকোচা করা ধুতি আর একটা সোয়েটার আছে তার পরনে। ঘরে ঢুকেই খালি হাত দু'খানা মাথার ওপর তুলে উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিল সে। নৃত্য আর হাসি, এমন হাসি হাসতে লাগল যে সমস্ত গোলমাল নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

জঙ্গী জোয়ান দু'জন তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ সোজা রেখে এগিয়ে গেলেন খাগড়াজোলের কাছে। যতটা সম্ভব বিনীত ভাবে বললেন ঃ

"প্লিজ লিভ হিম, দয়া করে সরে দাঁড়ান। ওঁকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।"

খাগড়াজোল এক পাশে সরে দাঁড়ালেন, দেখা গেল, মনুষ্যত্ববাদী মাথা হেঁট করে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ যেন বিস্ফোরণ হল ঘরের মাঝখানে। প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই ঃ

"কল্যাণ থাম, থাম বলছি শিগ্‌গির।"

ঝপ্ করে হাসি নৃত্য সব বন্ধ হয়ে গেল কল্যাণের। ভয়ার্ত

চোখে সে তাকিয়ে রইল রুদ্রমশায়ের দিকে। রুদ্রমশাই এগিয়ে এলেন কল্যাণের সামনে, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"হচ্ছে কি এ সমস্ত ?"

মিলিটারী অফিসার দু'জনও ঘুরে দাঁড়ালেন।

আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন রুদ্রমশাই ঃ

"উত্তর দাও জানোয়ার, কেন এভাবে এক ভদ্রমহিলার বাড়ি চড়াও হয়ে ইতরোমো জুড়ে দিয়েছ ?"

একজন অফিসার এগিয়ে এসে রুদ্রমশায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন আপনি। ওঁর কোনও দোষ নেই। মস্ত বড় এক ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছেন উনি। উনি—"

"শাট্ আপ্।"

বজ্রাঘাত হল যেন অফিসারের মুখের ওপর। আওয়াজের ঝাপটায় অফিসার এক হাত পিছিয়ে দাঁড়ালেন।

ছুটে এলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ

"করছ কি ? করছ কি শান্তনু ?"

এক হেঁচকায় পণ্ডিতজীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এক পা এগিয়ে গেলেন রুদ্রমশাই অফিসারের দিকে। বীভৎস অবস্থা হয়েছে তখন তাঁর মুখ চোখের। এক হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন ঃ

"দেখি পরোয়ানা।"

এতক্ষণ পরে আর একজন অফিসার কথা বললেন ঃ

"আপনি সরকারী কাজে বাধা দিচ্ছেন, সাবধান।"

হঠাৎ রুদ্রমশাই অদ্ভুত এক কাজ করে বসলেন। ঝপ্ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামনের অফিসারের হাতের ওপর। চক্ষের নিমেষে আগ্নেয়াস্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে এক টানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

সেটাকে দরজার বাইরে। হতভম্ব অফিসারটি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে।

তৎক্ষণাৎ অপর অফিসারটি চিৎকার করে উঠলেন :

"কেউ এক চুল নড়লে ফায়ার করব।"

তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন খাগড়াজোল প্রিন্স। "ফায়ার করব" কথাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সের ম্যান-ইটার মার্কা থাবা পড়ল গিয়ে অফিসারের মুখের ওপর। অপর থাবায় চেপে ধরলেন তিনি অস্ত্রসুদ্ধ অফিসারের মুঠোটি। এক মুহূর্ত পরে ছুটো থাবাই তনি টেনে নিলেন। অস্ত্রটি তখন খাগড়াজোলের হাতে।

খাগড়াজোল এবার কথা বললেন। খুশি মনে কথা বললেও তাঁর কথা বলার ধরনটাই বড় ভয়ানক। বললেন :

"এবার আপনারা সাবধান। আমাকে নিশ্চয়ই চেনেন বা নামটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। টিপ কখনও ফসকায় না বলে আমার একটা ভয়ানক বদনাম আছে।"

হাসি জুড়ে দিলেন রুদ্রমশাই, তাঁর সেই মার্কা-মারা ঘর-ফাটানো হাসি।

একজন অফিসার সেই হাসির মধ্যেই চিৎকার করে উঠলেন :

"এর জন্যে আপনাদের ফল পেতে হবে।"

খাগড়াজোল তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন :

"একশ'বার। এখন সুড়সুড় করে আপনারা চলুন তো আমাকে এস্কর্ট করে নিয়ে থানায়। আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আপনাদের অস্ত্রটাই আমার হাতে থাকবে এবং আমি আপনাদের পেছন পেছন চলব। আমরা চোর ডাকাত খুনে না অন্য কিছু, থানায় গিয়ে তার ফয়সালা হবে। আর মিসেস্ চৌধুরী, আপনি ততক্ষণ একটা ফোন করুন দয়া করে ডেপুটী কমিশনারের কাছে। আমার নাম করে বলুন, আমি তাঁকে থানায় আসতে অনুরোধ জানিয়েছি।"

এবার অফিসারের সুর নরম হল। বিনীত স্বরে বললেন :

"কিন্তু সার, এই ফেরারী আসামীর কি হবে ?"

"কে ও ? করেছে কি ?"

জিজ্ঞাসা করলেন রুদ্রমশাই।

জবাব দিল কল্যাণ। এতক্ষণ যেন তার দম আটকে ছিল, এই-বার ফেটে পড়ল তার দম। রুদ্রমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলল :

"জানেন না ? সেদিন যে সমস্ত কথা বার করে নিলেন আমার বুক থেকে, সব ভুলে গেলেন ?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রুদ্রমশাই। মুখ থেকে শুধু বার হল :

"অ্যাঁ !"

খাগড়াজোল অস্ত্রটা অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন :

"ধরুন এটাকে, আপনিও প্লিজ আপনারটা নিয়ে আসুন কষ্ট করে, ঐ তো পড়ে রয়েছে বাইরে। মেয়েরা ঘরে রয়েছেন, এখানে অস্ত্র চালান যায় না। অন্ততঃ জঙ্গী মানুষে কিছুতেই তা' পারবে না। এইটুকু জানা ছিল বলেই, আমি আপনার অস্ত্রটা কেড়ে নিতে সাহস করেছিলাম। এক্সকিউজ্ মি প্লিজ।"

অফিসারটি অস্ত্র নিলেন। অপর অফিসার বাইরে গেলেন তাঁর অস্ত্রটি আনতে। রুদ্রমশাই বললেন :

"তা'হলে চলুন, এবার, কোথায় আমাদের যেতে হবে চলুন।"

মালহোত্রা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক কোণে, বললেন :

"সেই ভাল কথা, আমাদের সকলকেই ধরে নিয়ে চলুন আপনারা।"

লর্ড অফ মিয়েরবেড় বললেন :

"এগ্‌জ্যাক্টলি। আমরা আমাদের কমরেডকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না।"

"কম্‌রেড !"

হেসে ফেললেন একজন অফিসার।

"উনি কি করেছেন না জেনেই বলে ফেললেন কম্‌রেড! বেশ চলুন সকলে। আমাদের কোনও দোষ নেই। আমরা আপনাদের যেতে বলছি না।"

ভাস্বতী সভয়ে বলে উঠল:

"এঁদের কি হবে?—এই মা আর এই কচি বাচ্চাটার?"

"কোনও ভয় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ওঁকে হাসপাতালে তুলে দেব। এখন হাসপাতালে না থাকলে উনি আর ঐ বাচ্চা বাঁচবে না।"

জবাব দিলেন একজন অফিসার।

রুদ্রমশাই কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করলেন:

"এ হতভাগী কে কল্যাণ? এই কি তোমার সেই—"

কল্যাণ মাথা নেড়ে জানাল:

"না, এ আর এক জন। এ রকম কত অভাগীর সর্বনাশ উনি করেছেন।"

লর্ড অফ মিয়েরবেড় প্রথমেই অগ্রসর হলেন। বললেন:

"চলুন, এখানে আর নয়। যথেষ্ট কাণ্ড করা গেল এক ভদ্র-মহিলার বাড়িতে। আশা করি, মিসেস্ চৌধুরী আমাদের ক্ষমা করবেন।"

মিসেস্ চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন:

"জাহান্নমে যাক। এই দেশ, এর শাসন ব্যবস্থা, সব জাহান্নমে যাক।"

বলতে বলতে প্রথমে তিনিই বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তারপর একে একে সবাই অনুসরণ করলেন গৃহকর্ত্রীকে। ভাস্বতী সেই হতভাগী মা আর তার বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। রুদ্রমশাই কল্যাণের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ রুদ্রমশায়ের সঙ্গ ছাড়লেন না, তাঁর ঠিক পেছন পেছন চলতে লাগলেন। সর্বশেষে অফিসার দু'জন হিউম্যানিস্টকে

দু'পাশ থেকে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের তখন হুঁশ আছে কি নেই, ঠিক বোঝা গেল না।

হিয়া শুধু গেল না।

প্রবৃত্তি হল না তার ঐ বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যেতে। হৈ-চৈ হট্টগোল মারামারি আর ভাল লাগে না তার। মানুষের মুখ দেখতেও ভয় করে। মানুষ মানুষ নেই, হন্তে কুকুর হয়ে উঠেছে। মানুষের মাঝে যেতে হবে মনে হলেই একটা কুৎসিত দৃশ্য হিয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যজ্ঞিবাড়ির দরজার পাশে আঁস্তাকুড়, একগাদা ভাঁড় খুরি কলাপাতা পড়ে রয়েছে, এক পাল লোম-ওঠা মড়াখেকো কুত্তা সেগুলো নিয়ে খাওয়াখায়ি করছে! এই দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলেই সে বড় একটা বেরতে চায় না বাইরে। নিজেদের ছোট বাড়িখানার মধ্যে তানপুরাটি নিয়ে নির্জনে বসে থাকতে পারলেই সে খুশি। আর সে কিছুই চায় না, কিছুই আর তার ভাল লাগে না।

কিন্তু সেই বাড়িও তাকে ছেড়ে আসতে হল। শেষ পর্যন্ত পথেই নামতে হল বাপের হাত ধরে। নিজের বলতে কোথাও কিছু রইল না। মুখ লুকিয়ে বেঁচে থাকার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত গেল।

কেন ?

কেনর জবাব খুঁজতে গিয়েই হয়ত মিসেস্ চৌধুরীর বিচিত্র সাজে সাজানো ড্রইংরুমখানার চতুর্দিকে একবার নজর ফেলল হিয়া। তার ফলে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল তার। গণ্ডাকতক আলো জ্বলছে চতুর্দিকে। কত জাতের উদ্ভট আচ্ছাদনের ভেতর যে জ্বলছে আলোগুলো। আলো জ্বালাবার জন্যে মানুষ কত রকমের আদিখ্যেতাই না করতে পারে। দেখতে দেখতে খুন চেপে গেল হিয়ার মাথায়। দেওয়ালের ধারে ঘুরতে লাগল সে। ঘুরতে লাগল আর সুইচ দেখলেই আলো নেভাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত

নিভল সব-কটা আলো, আঁধার হল ঘরখানা, তখন সে বসে পড়ল একখানা সোফায়। আঃ—এইভাবে একলা অন্ধকার ঘরে বসে সারা জীবনটা যদি সে কাটিয়ে দিতে পারত!

তিনটে মিনিটও কাটল না, একলা বসে থাকার সৌভাগ্য ঘুচে গেল। ফিরে এল ভাস্বতী। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বলে উঠল:

"এ কি! ঘর অন্ধকার কেন!"

"আলো নিভিয়ে দিয়েছি আমি। জ্বেলে দিচ্ছি।"

ভয়ানক ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল হিয়া, দিয়ে উঠতে গেল।

বাধা দিলে ভাস্বতী:

"না না, থাক না। বেশ ভাল লাগছে অন্ধকার। আমারও ভাল লাগছে না আলো।"

হিয়ার পাশে বসে পড়ল সে।

একটা কিছু বলা প্রয়োজন। হিয়া বলল:

"চলে গেলেন ওঁরা! দেখ আবার থানায় গিয়ে কি কেলেঙ্কারি ঘটে।"

হু' হুবার যেরকম স্বর বেরল হিয়ার গলা থেকে তা' শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল ভাস্বতী। একটু কাছে সরে এসে অন্ধকারের মধ্যে বন্ধুর মুখখানি দেখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল:

"কি হল! শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

"না ভাই, শরীর আমার ভালই আছে। এই সমস্ত গণ্ডগোল আর আমার সহ্য হচ্ছে না। কোথাও যদি লুকিয়ে থাকার জায়গা পেতাম!"

নির্বাক হয়ে রইল ভাস্বতী। যে স্বরে যে ভাবে জবাব দেওয়া হল তারপর আর কিছু বলা চলে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর হঠাৎ হিয়াই প্রথম কথা বলে উঠল। চুপিচুপি বলল:

"ভাস্বতী, চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।"

প্রস্তাবটি শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভাস্বতী। শেষে হিয়ার মত গলা খাটো করেই জিজ্ঞাসা করলে :

"কোথায় ?"

"এমন কোনও জায়গায়, যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব। চেনা-জানা কারও সঙ্গে দেখা হবে না। কেউ আমাদের ধরে আনতে পারবে না।"

বেশ উত্তেজিত শোনাল হিয়ার স্বর।

একটু ভেবে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করলে :

"তাতে লাভ হবে কি ?"

আরও তীক্ষ্ণ হল হিয়ার গলা, বললে :

"অনেক লাভ হবে। খুব লাভ হবে। চেনা-জানা লোকে ঠকায়, অচেনা লোকে ঠকায় না। যে দেশে কেউ আমাদের চেনে না, সেখানে গিয়ে শান্তিতে থাকব।"

নিস্তব্ধ হয়ে রইল ভাস্বতী, হিয়াও আর কথা বললে না। অনেকক্ষণ পরে আলতোভাবে ভাস্বতী বলল :

"ঠকানোর ব্যাপার তা'হলে সকলের জীবনেই আছে !"

"নিশ্চয়ই আছে। ঐ যে মেয়েটা বাচ্চা বুকে নিয়ে এসে দাঁড়াল, কি অবস্থা হবে এখন ওর ? কেন হতচ্ছাড়ী বিশ্বাস করে মরতে গিয়েছিল ? বিশ্বাস না করলে তো আর ঠকতে হত না। যেখানে বিশ্বাস সেখানেই ঠকানো। চল ভাস্বতী, চল আমরা পালাই এখান থেকে। এমন কোথাও যাই চল, যেখানে কাউকে বিশ্বাসও করতে হবে না, ঠকতেও হবে না।"

কথাগুলো এমন ভাবে বললে হিয়া, যে ভাস্বতী আর নীরব হয়ে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়াল সে হিয়ার সামনে। দাঁড়িয়ে অল্প একটু নুয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল :

"হ্যাঁ, পালাব, নিশ্চয়ই পালাব। পালাবার আগে এমন একটা কিছু করে যাব যে ঠকাবার কথা মনে করতেই লোকের হৃৎকম্প

হবে। এত হানাহানি এত শাসন এত আইন-কানুন যা করতে পারছে না, তাই করে যাব আমরা। ইজ্জত—ইজ্জত যাতে বাঁচে সকলের, তার ব্যবস্থা না করে কিছুতে যাব না।"

ভয় পেয়ে গেল হিয়া, তার গলাও খুব খাদে নেমে গেল। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠল :

"কি ভাই ? কি করতে চাও তুমি ?"

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে ভাস্বতী :

"তেমন কিছু নয়, ভয় পাবার মত কিছুই নয়। এই যে মানুষে মানুষকে ঢিল মেরে মেরে খুন করছে, ওই ভাবে মরবার ভয়ে আত্মহত্যা করছে অনেকে, আর ওধারে একজন নাগালের বাইরে লুকিয়ে থেকে সকলের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, এইগুলো চিরকালের মত বন্ধ করে দিয়ে যেতে চাই। তোমার গান—আমার নাচ, নাচে-গানে আমরা সব জিতে নেব। তারপর অবশ্য পালাব। এমন জায়গায় পালাব যে দুনিয়ায় কেউ আর আমাদের ধরতে ছুঁতে পারবে না।"

থামল ভাস্বতী, একটুখানি থেমে আবার বলল :

"যাই, তোমার তানপুরাটা নিয়ে আসি। এই অন্ধকারে বসে একটু আলাপ কর। আঁধারের বুকে যে সুর বাজে, তাই একটু আলাপ কর। শুনি একটু, বুকের ভেতরের অন্ধকারটা জমে নিরেট পাষাণ যাতে হয়, এমন সুর একটু শোনাও।"

"আঁধারের সুর। আঁধারের বুকে কোন্ সুর বাজে !"

খুবই চিন্তান্বিত শোনাল হিয়ার গলা। থেমে থেমে বেশ ভেবে-চিন্তে সে বলতে লাগল :

আঁধারের মধ্যে যে সুর মানায়, তা' ত' কান্না। গান গেয়ে কাঁদা—কাঁদতে কাঁদতে গান গাওয়া—অসম্ভব! ও সব শুধু থিয়েটারেই চলে। সঙ্গীতের রাজত্ব কান্নার অনেক ওপরে। আনন্দময়লোকে সঙ্গীতের উৎপত্তি। যেটুকু বিষাদের ছোঁয়া ধরা

দেয় সঙ্গীতে, তা' থেকেও আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। গান শুনলে মনের অন্ধকার ঘুচে যায়। আলো জ্বলে ওঠে মনের আনাচে কানাচে। যে গান শ্রোতার মন প্রাণ বিষাদের বিষে আচ্ছন্ন করে ফেলে, সে গান গান নয় ভাস্বতী। তা' হল শাসন—শাসন আর শাস্তি।"

বলা শেষ হল হিয়ার। ভাস্বতী শুনল কি না ওর বক্তব্যটুকু, বোঝা-ই গেল না। এতটুকু সাড়াশব্দ না করে স্থির হয়ে বসে রইল যেন সে আঁধারে মিশে। বেশ কিছুক্ষণ হিয়াও চুপ করে রইল। তারপর তার নিজের কথার জের টেনে নিজেকেই যেন শোনাতে লাগল :

"শাসন আর শাস্তি। কথা ছু'টো কত সোজা, আর কত রকমেই না ঐ কাজ ছু'টো করা হচ্ছে এ সংসারে। চতুর্দিকে শুধু শাসন আর শাস্তি। ভালবাসার শাসন, প্রেমের শাসন, স্নেহের শাসন, আত্মীয়তা ভদ্রতা ভাল মন্দ বিচারের শাসন।···মুক্তি কোথায়! ভালবাসা স্নেহ প্রেম করুণা সমস্তই মানুষকে শাসনের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার অছিলা। ও সমস্তই শাস্তি—শুধু শাস্তি। সঙ্গীতের স্থান মুক্তির আকাশে, খাঁচার মধ্যে বসে শুধু কাঁদাই সম্ভব, গান গাওয়া—কোন মতেই সম্ভব নয়।"

আবার থামল হিয়া। একটু সময় চুপ করে থেকে বলে উঠল :

"কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?"

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হল। তারপর ভাস্বতীর গলা শোনা গেল। বললে :

"না, ঘুমবো কেন। হেঁয়ালি শুনছি।"

"হেঁয়ালি!"

একটু চড়ল হিয়ার গলা।

"হেঁয়ালি করছি আমি! এর মধ্যে হেঁয়ালিটা দেখতে পেলি কোনখানে ?"

ভাস্বতীর কথা বলার ধরণ এতটুকু বদলাল না। একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে সে বলতে লাগল ঃ

"হেঁয়ালিটুকু লুকিয়ে আছে ঐ বন্ধন আর মুক্তি কথা দু'টির মধ্যে। কোন্‌টাকে বন্ধন আর কোন্‌টাকে মুক্তি বলব, তাই যে ভেবে পাচ্ছি না। এই ত' সে দিনের কথা, মন প্রাণ সর্বস্ব যখন নাগপাশের বাঁধনে বাঁধা পড়ছিল, তখন মনে মনে মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিলাম। ভাবছিলাম, আমার মত ভাগ্য কার! একটা মানুষ—আস্ত একটা পুরুষ মানুষ—রূপ গুণ বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য সরলতা, সব কিছু যখন সমর্পণ করল আমায়, তখন সে কি গর্ব! কত বড় ভেবেছিলাম নিজেকে! একটিবারের জন্যেও ত' তখন সন্দেহ করতে পারি নি যে কি ভয়ানক বঞ্চনার বাঁধনে নিজেকে বাঁধছি। মনে হয়েছিল, জীবনটাই যেন একটা সঙ্গীত, মুক্তির সঙ্গীত। আর আজ—"

থেমে গেল ভাস্বতী। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল হিয়ার সামনে। মুখ নুইয়ে হিয়ার মুখের কাছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ

"ভাগ্য মানিস হিয়া?"

থতমত খেয়ে হিয়া বলে উঠল ঃ

"ভাগ্য!"

"হ্যাঁ—ভাগ্য। জানলি হিয়া, আমার স্বামী খুব ভাল জ্যোতিষ জানত। দেশবিদেশের খবরের কাগজে বর্ষফল মাসফল সপ্তাহফল লিখত। আখেরী পন্থ্ নাম শুনিস নি কখনও?"

জিজ্ঞাসা করলে ভাস্বতী।

হিয়া খুবই মিয়নো সুরে জবাব দিল ঃ

"শুনেছি বৈ কি! অনেক কাগজেই ত' ঐ নাম দেখি।"

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ভাস্বতী, অনেকটা ছেলেমানুষী উত্তেজনা। বললে ঃ

"ঐ আখেরি পন্থ-ই আমার স্বামী। কত বড় বড় মানুষ ঐ গুণটুকুর জন্যে তার হাতের মুঠোয় ছিল। একবার কি হয়েছিল জানিস? আমার ভাগ্যটা গোণবার জন্যে আমি খুব আবদার ধরেছিলাম। প্রথমে ত কিছুতেই রাজী হবে না। তারপর গুণে কি বলেছিল জানিস?"

এতক্ষণে হিয়াও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল:

"কি? কি বলেছিলেন তিনি?"

"বলেছিলেন—যা বলেছিলেন তাও ফলল না। তাতেও আমায় ঠকিয়েছিলেন। ভাগ্যফল শুনে তখন অবশ্য মনে মনে কামনা করেছিলাম, যেন তাঁর গণনা মিথ্যে হয়। বলেছিলাম—দেখবে জ্যোতিষী মশায়, তোমার এই গণাটা ভুল হবে। শুনে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন—যে গুরুর কাছ থেকে ঐ বিদ্যে তিনি পেয়েছেন, সেই গুরুর নামে পাছে কলঙ্ক পড়ে, তাই তিনি গণনা করে যা বোঝেন তা বলেন। কখনও কাউকে ঐ ব্যাপারে মিথ্যে স্তোক দেন না। আমি হেসেছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, যদি স্বামীর গণনা কোনও দিন ফলেই বসে! এখন দেখছি, তাও ফলল না। তার মানে, গুরুর নাম করেও সে আমায় ঠকাতে ছাড়ে নি। মিথ্যে ভয় পাইয়ে দিয়ে আমাকে আরও কাবু করে ফেলেছিল।"

হিয়া আর থাকতে পারল না। আবার জিজ্ঞাসা করে বসল:

"বলনা, কি বলেছিলেন তিনি? সেটা শুনলে তবে ত বুঝব, যে ভাগ্যফলটা কখনও ফলবে কি ফলবে না।"

ভাস্বতীর ভেতর থেকে সব উত্তাপ, সব ঝাঁজ উবে গেছে ততক্ষণে। একান্ত নির্জীব সুরে বলল:

"শুনবি? শুনে আর কি লাভ হবে বল? আমার ভাগ্যফল কিছুতেই আর ফলবে না। সে উপায় আর নেই। এখন তাকে রাস্তার মানুষে ঢিল মেরে মারবে, বা পেট্রোল ঢেলে পোড়াবে।

কিন্তু তা ত' হবার কথা ছিল না। মস্তবড় জ্যোতিষী স্বামী গুণে বলেছিলেন যে আমার হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। বলেছিলেন, আমি স্বামীঘাতিনী হব, আমার যে দেবারিগণ—"

ভাস্বতীর গলা আটকে গেল।—নিজের হাতে স্বামীকে মারতে পেল না, এই আক্ষেপেই যেন গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল তার।

ভাগ্যফল শুনে শিউরে উঠে কাঠ হয়ে বসে রইল হিয়া।

অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বললে ভাস্বতী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে ঃ

"যাই, তানপুরাটা নিয়ে আসি। যা হোক, একটা কিছু শোনা। না হয় এমনই একটা কিছু শোনা, যাতে ঠকবার জ্বালাটা কিছুক্ষণের জন্যেও একটু ভুলতে পারি।"

বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ভাস্বতী। অন্ধকারে ডুবে বসে রইল হিয়া।

কষ্টিপাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল। অন্ধকারটা ক্রমেই যেন আরও নিবিড়, আরও রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল।

অন্ধকারের বুকে কোন্ সুর বাজে!

হিয়া ভাবতে লাগল, কোন সুরে গান গাইলে অন্ধকারের ভাষা প্রাণ পাবে। অন্ধকারের কি প্রাণ আছে! যার মধ্যে প্রাণ নেই, তার মধ্যে কি সুর থাকতে পারে? প্রাণ নেই যেখানে, সেখানে ধ্বনিও নেই। ধ্বনি যেখানে নেই, সেখানে সুরও নেই। কি আলাপ করবে সে! কি শোনাবে ভাস্বতীকে!

অন্ধকারের ভাষা বোঝবার জন্যে প্রাণমন এক করে স্থির হয়ে বসে রইল সে। এতটুকু ধ্বনি, একটুখানি ভাষাও যদি ধরা পড়ে কানে, তা'হলে সুরটাও হয়ত সে ধরে ফেলতে পারবে। সুরটা না ধরতে পারলে কি আলাপ করবে সে! ভাস্বতী আনতে গেছে তানপুরা, তানপুরায় অন্ধকারে সুর কি ধরা দেবে

হঠাৎ হিয়ার মনে হল, কি যেন সে শুনতে পাচ্ছে! ঠিকই শুনতে পাচ্ছে সে কিছু! একটু নড়ে উঠল তার দেহটা, আরও একটু লম্বা হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল তার মনের মধ্যের শোনার যন্ত্রটা। অন্ধকারের ভাষা বুঝতে হবে।

অবশেষে যেন বোঝা গেল।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল হিয়া, সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটি একপাশে একটু কাত করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। কি যেন শুনতে পেয়েছে সে! নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে কিছু। অন্ধকার কি খুব চুপিচুপি ফিসফিস করে কথা বলে!

হঠাৎ তার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঢিপঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। শুনেছে সে, নিশ্চয়ই শুনেছে। তটস্থ হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আওয়াজটা আসছে কোন্ দিক থেকে!

তানপুরা নিয়ে ফিরে এল ভাস্বতী। দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকবার সময় নিমেষের জন্যে একছিটে আলো পড়ল ঘরের মধ্যে। যেন খুব লম্বা একখানা ছোরা আমূল প্রবেশ করল অন্ধকারের বুকে। পরমুহূর্তে একটু ঝঙ্কার উঠল তানপুরার তারে। ঘরের মাঝখানে হিয়ার আঁধার অবয়ব দেখতে পেল ভাস্বতী। ও-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল:

"এ কি? এমনভাবে দাঁড়িয়ে যে! কোথায়—"

"চুপ।"

খুব চাপা গলায় থামিয়ে দিলে হিয়া ভাস্বতীকে। আরও চাপা গলায় বললে:

"কথা বলিস নি, অন্ধকারের সুর কেটে যাবে।"

"অন্ধকারের সুর! সে আবার কি!"

দস্তুরমত ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে ভাস্বতী।

"যে সুর শুনলে বুকের ভেতরের অন্ধকারটা জমে নিরেট পাষাণ হয়,—যা তুই শুনতে চাস।"

হিসহিস করে জবাব দিলে হিয়া। হেসে উঠল ভাস্বতী :

"দূর, এমন ভয় পাওয়াতে পারিস। সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। নে, চল বসিগে। একটু গান হোক।"

শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল হিয়া, ফিরে চলল আবার বসবার জায়গায়। অন্যমনস্কভাবে বলল :

"কান ঠিক হয় নি তোর, কান ঠিক না হলে অন্ধকারের সুর শোনা যায় না।"

ভাস্বতী বলল :

"দরকার নেই আমার সেই সুর শুনে। দোহাই তোমার, আর ভয় দেখিও না। এই নাও বাজনা, এবার একটু শোনাও কিছু। এমন কিছু শোনাও, যাতে আর কয়েকটা দিন মাথাটা ঠিক রাখতে পারি। আর পারছি না আমি, এই মুখ নিয়ে সকলের সামনে বেরিয়ে ন্যাকামি করতে আর কিছুতেই পারছি না।"

আর কথা বাড়াল না হিয়া—। তানপুরা নিয়ে সামান্য একটু সময় দু' একটা মোচড় দিল যন্ত্রটার কানে। সুর বাঁধা হয়ে গেল। ধরল হিয়া আলাপ, দরবারীর গম্ভীর তানে সত্যিই যেন প্রাণ পেল আঁধার। সুরের ঘুম ভাঙতে লাগল। সুর জাগছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের মুখে ভাষা ফুটছে।

তিমিরের তীরে কুহেলী কামনা
আলোর আলেয়া কাঁদে
আলোর আলেয়া কাঁদে।
স্বপন-শায়কে কি ব্যথা জান না
বেঁধ না ছলনা-বাঁধে।
আর ফেলনা ছলনা-ফাঁদে॥

একবার দু'বার তিনবার, কয়েকবার গাইল ঐটুকু হিয়া! সৃষ্টি

হল সুরলোক। অতি বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধকের কন্যা সে, অতি শৈশব থেকে পিতার কাছে শিক্ষা নিয়েছে। শুধু সুর তাল লয় অভ্যাস করে নি, তার চেয়ে অনেক বড় একটি জিনিস পেয়েছে সে পিতার কাছে। সঙ্গীতের মর্মবাণী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে তার। সেই মর্মবাণীকে নিজের কণ্ঠে সে রূপ দিতে পারে। তাই সে করে ফেললে, অন্ধকার ঘরে আবির্ভূত হল দরবারী কানাড়া। আনন্দ, আতঙ্ক না আর কিছু, ঠিক বুঝতে পারলে না ভাস্বতী। তার মনে হল যেন গুরুভার একটা আচ্ছাদনের তলায় সে চাপা পড়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কিন্তু উঠে হেঁটে পালাবে যে ঘর ছেড়ে, সে ক্ষমতাও তার নেই। গান্ধারের আন্দোলনে ক্রমেই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

গান শেষ হল, সুরের রেশটুকু কিন্তু সহজে ঘর ছেড়ে পালাল না। আলোর আলেয়া অন্ধকারের মধ্যে গুমরে গুমরে কাঁদতেই লাগল। ভাস্বতী আর হিয়া ডুবে রইল সেই কান্নার মধ্যে। পাছে থেমে যায় কান্নাটা, এই ভয়ে একটু নড়াচড়া করার সামর্থ্যও কারও হল না।

অকস্মাৎ কান্নার অন্তরে কাকুতি ফুটে উঠল। বোবা আঁধার মুখর হল যেন। অস্বাভাবিক রকমের একটা ক্লান্ত সুর ধরা দিল ওদের কানে:

"নাঃ, কোনও কিছুরই দরকার করে না। ঠিক সুরে ঠিক জায়গায় আঘাত দিতে পারলে নিশ্চয়ই সব পালটে দেওয়া যায়।"

"কে! কে!"

এক সঙ্গে এক সুরে আঁতকে উঠল হিয়া আর ভাস্বতী।

"কেউ নয়, ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠার মত কেউ নয়। নিতান্ত নিরীহ একটি মনুষ্য সন্তান।"

ঢিমে চালে বলা হল কথাগুলো। আত্মপরিচয়টা নেহাতই

সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল মনে হওয়ার ফলেই বোধ হয় আরও একটু বলতে হল শেষে।

"গান শোনার লোভ সামলাতে পারলাম না, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এক কোণে বসে আছি। অন্যায় হয়ে গেছে, মানছি। কিন্তু সাড়া দিলে যে গানের গয়াপ্রাপ্তি ঘটত।"

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হিয়া। দম-আটকানো গলায় বলে উঠল :

"কে! তাপস! তাপস রুদ্র—"

তৎক্ষণাৎ জবাব মিলল :

"নির্ঘাত ধরে ফেলেছ দেখছি। হাঁ, আদি এবং অকৃত্তিম তাপস রুদ্র। এইবার দমটা ফেল নিশ্চিন্ত হয়ে। নয়ত বুক ফেটে মরবে যে শেষ পর্যন্ত।"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্রত্যেকের। তারপর ওরা দেখতে পেল; দেখল, দরজার সামনের সোফার কোণটিতে দীর্ঘ এক মূর্তি স্থির হয়ে বসে আছে। মিশমিশে কালো একটা ফেল্ট হ্যাট্ রয়েছে মাথায়। টুপিটা বোধ হয় মাপে একটু বড়, টুপির আওতায় প্রায় ভুরু পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। ফলে মুখখানা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মূর্তিটি, বেশ কষ্ট করেই যেন খাড়া করল দেহটাকে। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত লম্বা ওভারকোটের ভারে সামান্য একটু নুয়ে পড়ল সামনে। দু'পা এগিয়ে এসে আলোর দিকে মুখ তুলে দাঁড়াল। টেনে টেনে বলল :

"মিলিয়ে নাও, বেশ করে দেখে-শুনে মিলিয়ে নাও। সত্যি-কারের তাপস রুদ্র যদি না হই, গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দাও।"

গলার আওয়াজ আর বলার ধরন এমন যে নিজেকে স্থির

রাখতে পারলে না হিয়া। ছুটে গিয়ে ওভারকোটটা খামচে ধরে বলে উঠল :

"কি হয়েছে! হয়েছে কি তোমার! অসুখ করেছে নাকি?"

তখনও দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সুইচের ওপর একখানি হাত রেখে ছবির মত দাঁড়িয়ে ভাস্বতী। নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে আছে সে, ঠিক কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

তাপস রুদ্র একবার ভাস্বতীর দিকে তাকাল। তারপর হিয়ার চোখের ওপর চোখ রেখে ফিস ফিস করে বলল :

"অসুখ! কৈ না। অসুখ করবে কেন? সুখেই তো ছিলাম বেশ। তবে বেশী দিন বেশী রকম সুখে থাকাটা আবার সহ্য হয় না কিনা, তাই পালিয়ে এলাম।"

"পালিয়ে এসেছ! তা' হলে—"

বলেই থেমে গেল হিয়া। আর কি বলা যায় ভেবে পেল না। ওভারকোট খামচে ধরেছিল যে হাতখানা দিয়ে, সেই হাতখানা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এক হাত তুলে হিয়ার মুঠিটা টিপে ধরল তাপস রুদ্র। খুব পাতলা ঠোঁট দু'খানি তার অপরূপ ভাবে একটু বেঁকে গেল, মাথাটা একটু হেলিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন খুঁজল সে হিয়ার চোখের মধ্যে। তারপর ঠোঁট দু'খানি একটু ফাঁক হল, গাঢ় স্বরে বলল :

"তোমার কাছেই তো পালিয়ে এলাম। পালিয়ে আসার ফলে কি হবে, তুমি বুঝবে।"

এবার হিয়ার ঠোঁট দু'খানি কাঁপতে লাগল। একটু সময় মুখখানি ওপর দিকে তুলে তাপস রুদ্রের চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মাথা নুইয়ে ফেললে। তাপস রুদ্র তখনও একভাবে তার হাতের মুঠিটা টিপে ধরে আছে।

দেওয়ালের কাছ থেকে এগিয়ে এল ভাস্বতী। ভয়ানক

অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে যেন সে। অন্যমনস্ক অবস্থায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল :

"পালিয়ে এসেছে! আবার সেই পালানো! এ আবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?"

প্রশ্নটি যেন নিজেকেই নিজে করল ভাস্বতী। উত্তর দিল কিন্তু তাপস রুদ্র। হিয়াকে ছেড়ে দিয়ে এক পা এগিয়ে এল সামনে। এতক্ষণ পরে একটু কঠিন হয়ে উঠল তার স্বর। বলল ঃ

"কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছি, জানতে চান? সোজা জবাব—না পালালে প্রাণ বাঁচছে না। বন্দী করে রেখেছিল আমাকে, লুকিয়ে রেখেছিল, গুম করে রেখেছিল। কত দিন পারে মানুষ লুকিয়ে বেঁচে থাকতে? লুকিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক সোজা।"

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল হিয়া তাপস রুদ্রের পিঠের ওপর। পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল তার মুখ। চাপা আর্তনাদ করে উঠল :

"চুপ, টের পাবে। এখনই জানতে পারবে সকলে। আবার তোমায় ধরে নিয়ে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে টপ করে সুইচ্‌টা টিপে দিলে ভাস্বতী। তৎক্ষণাৎ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল ওরা। কয়েকমুহূর্ত কেউ আর নড়তেও পারলে না।

সেই মৃত্যুর মত স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল অতি হিংস্র ফোঁস-ফোঁসানি। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কালনাগিনী যেন নিজের গায়ে নিজে ছোবল মারছে।

"আবার আর একজন! আর একটি বলি! পৈশাচিক আইনের খিদে কিছুতে মিটবে না! পালিয়ে বেড়াতে হবে, লুকিয়ে থাকতে হবে, কিংবা আত্মহত্যা করে রেহাই পেতে হবে পৈশাচিক আইনের সর্বনাশা গ্রাস থেকে।...পুড়িয়ে দেব, ছাই করে দেব আইন।

আইন যারা বানিয়েছে, তাদের হাড়-মাস ঝলসে খাবে দেশের মানুষ সেই আগুনে—”

আর একবার চাপা আর্তনাদ করে উঠল হিয়া :

“ভাস্বতী। থাম, থাম ভাস্বতী, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, থাম– ”

থেমে গেল ভাস্বতী। আবার নিঝুম হল অন্ধকার ঘরখানা। বেশ কিছুক্ষণ বিন্দুমাত্র সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

তারপর শোনা গেল হাসির আওয়াজ। খুশির হাসি নয়, প্রেতের হাসি, হাহাকার যেন হাসির রূপ নিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে সজীব হয়ে উঠল। তাপস রুদ্র হাসছে, অমন মর্মান্তিক হাসি যে হাসা যায়, তাও হয়ত জানা ছিল না হিয়ার। হাসির মধ্যেই সে ধমক দিয়ে উঠল :

“এই, অমনভাবে হাসছ যে !”

“কেন হাসছি ? কি আশ্চর্য ! হাসব না তো কি কাঁদব নাকি !”

হাসি থামিয়ে বলতে লাগল তাপস রুদ্র।

“আইন করে হাসাও বন্ধ করে দিয়েছে বুঝি ! কৈ, তেমন সুসংবাদটি তো এখনও পাই নি।”

“পান নি বুঝি ! এবার পাবেন।”

আবার সেই ফোঁসফোঁসানি শোনা গেল।

“নিশ্চয়ই এবার না-হাসার আইন চালু হবে দেশে। কাগজের ওপর কলম দিয়ে সে আইন লেখা হবে না, লোকের বুকের মধ্যে রক্ত দিয়ে লেখা থাকবে। হাসবে না, ভয়ে হাসবে না কেউ। হাসতে গেলে দম আটকে মারা যাবে। এতকাল মানুষ হেসেছে, অন্যায় অবিচার লোভ প্রতারণা সমস্ত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষুধা মৃত্যু ব্যাধি হেলায় জয় করেছে হাসার শক্তিটি থাকার দরুন। একদিকে নরপিশাচরা মানুষের বুকের রক্ত শোষবার নিখুঁত ব্যবস্থা করেছে, অপর দিকে মানুষ সত্য শিব সুন্দরের নেশায় মাতাল হয়ে হাসতে হাসতে তিলে তিলে মরণ বরণ করেছে। কিন্তু আর তা হবে না!

হাসতে ভুলে যাবে মানুষ, পৃথিবীর বুক থেকে আনন্দ আর হাসি, এই দুটো কথা চিরকালের জন্যে মুছে যাবে। শুধু একটি জিনিস থাকবে তখন, একটি মাত্র শক্তিই তখন থাকবে মানুষের। শক্তিটির নাম কান্না, ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য সমস্ত গ্রাস করবে কান্না-রাক্ষসী। মানুষ আর তখন মানুষ থাকবে না, কান্নার যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।”

ফোঁসফোঁসানিটা মিলিয়ে গেল।

“না, হল না। ঠিকভাবে বলতে পারলেন না আপনি। গুলিয়ে ফেললেন শেষের দিকে।”

প্রাণহীন যন্ত্র যেন কথা বলে উঠল। আবেগ উত্তেজনা উচ্ছ্বাস, রাগ দ্বেষ দুঃখ, কোনও খাদ নেই তাপস রুদ্রের স্বরে। একটু থেমে আবার বলতে লাগল ঃ

“কান্নাও থাকবে না। কাঁদবে তখন কি নিয়ে মানুষ? কোন্ দুঃখে কাঁদতে যাবে? সবাই সবাইয়ের ওপর ভেতর পরিষ্কার দেখতে পাবে। কার মনের ভেতর কি হচ্ছে, তা' নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামিয়ে মরবে না। প্রত্যাশা করার, কল্পনা করার, স্বপ্ন দেখার এতটুকু অবকাশ থাকবে না কোনও দিকে। মা ছেলের মন দেখতে পাবে, ছেলে মায়ের মন জানতে পারবে। স্বামী স্পষ্ট পড়তে পারবে স্ত্রীর মনে কি আছে, স্ত্রী স্বামীর বুকের গুহ্যাতিগুহ্য সংবাদও শুনতে পারবে। কেউ কাকেও ঠকাতে পারবে না। কারও কাছ থেকে কেউ কিছু আশা করবে না, নিরাশ হবার ভয় একেবারে ঘুচে যাবে দুনিয়া থেকে। কাঁদবে তখন কি নিয়ে মানুষ?”

তৃতীয়বার আর্তনাদ করে উঠল হিয়া ঃ

“থাম বলছি শিগ্‌গির। পাগল হয়ে যাব আমি এবার। তোমাদের সেই ভয়ঙ্কর জানাজানির জগতে আমি বাঁচতে চাই না। গলা টিপে মেরে ফেল আমায়, তারপর তোমরা তোমাদের সেই না-ঠকবার দুনিয়াটাকে বানিয়ে ছেড়।”

তাপস রুদ্র থামল না, আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল :

"হ্যাঁ কাঁদবে। তখনও থাকবে কান্না বেঁচে। মানুষের মাঝে থাকবে না বটে, আর এক জায়গায় ঠিক বেঁচে থাকবে। মানুষের বুকের মধ্যে হৃদয় বলে ত' আর কিছু থাকবে না। কিন্তু আকাশ বাতাস ফল ফুল রোদ বৃষ্টি আঁধার জ্যোৎস্না এদের হৃদয় বেঁচে থাকবে। ওদের হৃদয় কাঁদবে মানুষের জন্যে, যেমন আজ এই হিয়া কেঁদে উঠল। মানুষ জাতটার চরম পরিণাম দেখে নিখিল বিশ্বের হিয়া তখন কাঁদবে। কাঁদবে আর বলবে,—মানুষ জাতটা যদি এত বেশী জেনে না ফেলত! জানতে জানতে শেষ পর্যন্ত মনের রহস্যও মানুষের অজানা রইল না। মন জানার ফলে মানুষ মানুষকে যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। যন্ত্রের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করে ফেলল। যে হৃদয় দোষ অন্যায় করে, সেই হৃদয়েতেই দয়া প্রেম করুণা বাসা বাঁধে। অনাচার করে বলে হৃদয়টাকেই বিসর্জন দিলে মানুষ,—দয়া প্রেম করুণার কথা বেমালুম ভুলে গেল।"

থামল তাপস রুদ্রের গলা, শুরু হল ভাস্বতীর চিৎকার। দম ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল সে :

"যাক, সব পুড়ে ছাই হোক। বিশ্বাস, ভালবাসা, অকপট আত্মসমর্পণ, এততেও যখন হৃদয়ে ঘা লাগে না, তখন পুড়ুক হৃদয়। হৃদয় পুড়লে লোভ পুড়বে, ঠকাবার প্রবৃত্তি পুড়বে, বিশ্বাসঘাতকতা পুড়বে! এই মুখোশ-পরা সমাজের মুখ পুড়বে! এমনভাবে পুড়বে যে সেই পোড়ামুখ নিয়ে মুখোশ-নৃত্য দেখানো আর চলবে না।"

ভাস্বতীর কথা শেষ হবার আগেই অদ্ভুত একটা আওয়াজ উঠল কোথা থেকে। আওয়াজটা ভাস্বতীর কানেও গেল, তাই সে ঝপ করে থামিয়ে ফেলল তার চেঁচানি। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

তিনজনে। তখন বোঝা গেল, কোথা থেকে একটা গোঙানি উঠছে যেন। মনে হল, অন্তিম কাতরানি কাতরাতে কাতরাতে কে যেন এগিয়ে আসছে অশরণ অলীকের কাছে।

হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠল হিয়া ঃ

"আলো জ্বালা, শিগ্‌গির আলো জ্বালা ভাস্বতী। আবার কার সর্বনাশ হল দেখ্।"

আলো জ্বলল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল তাপস রুদ্র। ওরা দু'জন দম আটকে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। মরণ-যাতনায় গোঙাতে গোঙাতে কে আবার আসছে!

প্রতীক্ষা, অতি কুৎসিত প্রতীক্ষা, বিভীষিকার প্রতীক্ষা। এবার কার পালা এল পিশাচের গ্রাসে যাবার, এইটুকু জানার জন্যে প্রতীক্ষা। এই বিষাক্ত প্রতীক্ষার শেষ কোথায়!

এরই নাম জীবন! অহরহ কুৎসিত মরণের ভয়ে শিউরে থাকার নাম জীবন। কি চমৎকার বেঁচে থাকা! মরণ ওত্ পেতে বসে আছে চারিদিকে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে পড়বে তার খপ্পরে, তার প্রতীক্ষায় বেঁচে থাকার নাম জীবন। শেষ করে দাও, এই ভাবে বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয়, তবে এই নিষ্ঠুর জীবনের অবসান হোক জীবন-দেবতা। আর সহ্য হয় না।

হিয়া আর ভাস্বতী, সুন্দরের পূজারিণী ওরা। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাতে লাগল ওদের জীবন-দেবতার কাছে, এই নিষ্ঠুর প্রতীক্ষার শেষ হোক।

অবশেষে অবসান হোল প্রতীক্ষার। দরজার ওপর দেখা গেল তাপস রুদ্রের পেছনটা, পেছু হেঁটে ঘরে ঢুকল সে। কাকে যেন বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে নিয়ে আসছে। তখনও চলছে গোঙানিটা, চলছে খুবই ক্ষীণ ভাবে। তাপস রুদ্রের বুক থেকেই যেন উঠছে সেই গোঙানিটা। খুবই সন্তর্পণে পেছু হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল তাপস রুদ্র, বুকের সঙ্গে যাকে জাপটে ধরে নিয়ে

এল, তার পা দু'খানা ঘষটাতে ঘষটাতে এল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জন তাকিয়ে রইল।

তারপর সেই গোঙানিটা চাপা পড়ল তাপস রুদ্রের বুক-ফাটা আর্তনাদে :

"হিয়া, মাকে নিয়ে এলাম। মাকে শেষ করে দিয়েছে! এই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে চলে এসেছে মা তোমার কাছে।"

"এঁ্যা—মা!"

অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে উঠল হিয়া। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে। তারপর ওরা দু'জনে খুবই সন্তর্পণে মাকে একটা সোফায় শুইয়ে দিলে।

জড়িয়ে জড়িয়ে দু'বার ডাক দিলেন ইন্দুমতী :

"হিয়া,—হিয়া।"

ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে খুব লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নেতিয়ে পড়লেন। সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের বুকের ওপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হিয়া, তাপস রুদ্র পাথরের মত নিশ্চল হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দূর থেকে ভাস্বতী তাকিয়ে রইল ওদের দিকে, যেন নিবাত নিষ্কম্প একটা দীপশিখা, জ্বলছে—শুধু জ্বলছে।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দুমতী অতি কষ্টে একখানি হাত তুললেন, হাতখানি আস্তে আস্তে পড়ল হিয়ার মাথার ওপর। তখন তাঁর কাতরানি অনেকটা কমে এসেছে, অনেকটা যেন শান্তি পেয়েছেন তিনি। চোখ কিন্তু মেললেন না। চোখ বুজে খুবই চাপা স্বরে বহুকষ্ট করে বলতে লাগলেন :

"হিয়া মা আমার, কেড়ে নে মা, কেড়ে নে।...কেড়ে নিয়ে সেই সর্বনেশে জিনিসটা পুড়িয়ে ফেলে দে।...মা হয়ে পেটের ছেলের হাতে...বিষ তুলে দিয়েছি আমি, সব শেষ করে দিয়েছি।...সেই

বিষের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে—সে আমাকে আর মা বলে চিনতে পারছে না,···তোকেও চিনতে পারছে না। সকলের মনের মধ্যে কখন কি হয়,—সবই, সবই সে টের পায়।···এখন আর সে মানুষ নেই মা,—রাক্ষস, রাক্ষস হয়ে দাঁড়িয়েছে।···কেড়ে নে মা,—শিগ্‌গির কেড়ে নে তার হাত থেকে—সেই মারাত্মক অস্ত্রটা—"

মুখ তুলে তাপস রুদ্রের মুখপানে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল হিয়া। ইন্দুমতী কি বলেছেন, কিছুই তার মাথায় ঢুকল না।

তাপস রুদ্র নুয়ে পড়ল। মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

"এই দেখ মা আমি এসেছি, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে।—চোখ মেলে দেখ মা একটিবার, কিছুই বদলায় নি আমার। ফেলে দিয়েছি আমি সে জিনিস, নষ্ট করে দিয়েছি। পৃথিবীতে কেউ আর সে জিনিস হাতে পাবে না।"

ইন্দুমতী বিড়বিড় করতে লাগলেন :

"এসেছিস বাবা ?····এসেছিস তা'হলে ?—বড্ড দেরি করে এলি বাবা,···বড্ড দেরি হয়ে গেল তোর।—তারা তোকে খুঁজছে, কোথায় তুই আছিস বলতে না পারার দরুন ওরা···ওরা আমার বুকের ওপর পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল।····গুলাব ঠাকুরপো বাধা দিতে গিয়েছিল,—তাকে, তাকে কেটে ফেলেছে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।····মরে গেছি ভেবে তারা আমায় ফেলে রেখে গেল।—জ্ঞান হতে এখানে আসতে লাগলাম।···কি কষ্টে যে এসেছি !···তোর বাপকে সাবধান করতে হবে যে !···তারা তাকেও মারবে।···তাকেই···খুঁজতে···গেছে তারা। তাকে পেলে আর—

আর পারলেন না ইন্দুমতী, উপরি-উপরি দু'টো হেঁচকি উঠল। হেঁচকির ধকল সামলাবার জন্যে চোখ চাইলেন তিনি একবার। চোখ চেয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

ডুকরে কেঁদে উঠল হিয়া—"মা, মাগো, ওমা—"

ডুকরে চেঁচিয়ে উঠল ভাস্বতীও :

"ডাক্তার, ডাক্তার ডাকতে হবে। এখনই হাসপাতালে নিয়ে চল—"

ছুটে চলে গেল সে ঘরের কোণে। সেখানে ছিল টেলিফোন, রিসিভারটা তুলে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল :

"হ্যালো হ্যালো—"

লাফ দিয়ে ভাস্বতীর কাছে পৌঁছল তাপস রুদ্র, এক হেঁচকায় রিসিভারটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে। কঠোর কণ্ঠে বলল :

"সাবধান, মাথা ঠিক রাখুন। মা আর নেই, মাকে কিছুতে বাঁচান যাবে না। অনর্থক লোক জানাচ্ছেন কেন?"

ঘাবড়ে গেল ভাস্বতী, ভয়ানক আশ্চর্যও হয়ে গেল। বলল :

"ডাক্তার ডাকবো না!"

"না। ডাকবেন না।"

শান্তভাবে জবাব দিল তাপস রুদ্র।

"ডাকবেন না, সব শেষ হয়ে গেছে, এখন ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। ডাক্তার আসবার আগে শত্রু আসবে। দেখছেন না, ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে। শত্রুরা যদি টের পায় আমি এখানে আছি, তা'হলে আপনাদের এই বাড়ি এখনই জ্বালিয়ে দেবে।"

ইন্দুমতী আবার নড়ে উঠলেন। রিসিভারটা টেলিফোনের ওপর রেখে ছুটে এল তাপস রুদ্র বিছানার ধারে। ইন্দুমতী বহু চেষ্টায় আর কয়েকটি মাত্র কথা উচ্চারণ করতে পারলেন :

"ক্ষমা,···ওরে ক্ষমা।—প্রতিহিংসা নয়,···ক্ষমা দিয়ে সব জয় কর।—তোর বাবা যেন—আমায়—ক্ষমা—আমায় ক্ষমা—"

আবার হেঁচকির ধাক্কা উঠল ভেতর থেকে। সে ধাক্কাটা তিনি আর সামলাতে পারলেন না। দু'একবার একটু কেঁপে উঠল সর্ব-শরীর, তারপর নিথর হয়ে গেলেন।—হিয়া আর একবার ডুকরে উঠল :

"মা—মাগো—"

ক্ষমা দিয়ে জয় করতে হবে, শেষ কথা বলে গেলেন ইন্দুমতী। তিনজনেই শুনল সেই আদেশ। তিনজনের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ হাহাকার করে উঠল—"মা মাগো—"। সে হাহাকার মরণের ওপারে যিনি পৌঁছলেন, তাঁর কাণে হয়ত পৌঁছলই না। আর একজন টুপি-আঁটা মাথাটা নুইয়ে স্থির হয়ে রইল। বোধহয় মৃত্যুকে ক্ষমা দিয়ে জয় করা যায় কি না, সেই কথাই চিন্তা করতে লাগল সে তন্ময় হয়ে। আর একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তাপস রুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে বীভৎস স্বরে জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি কে! কে তুমি ?"

আস্তে আস্তে মুখ তুলল তাপস রুদ্র, তাকাল ভাস্বতীর মুখের দিকে। তারপর নিতান্ত সোজা ভাষায় জবাব দিল :

"ছেলে।—ঐ যে মা চলে গেল, ওঁর ছেলে আমি।"

"কি করতে ? কোথায় ছিলে ?"

প্রেতিনীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখন তাপস রুদ্রের মুখের ওপর ভাস্বতী। প্রেতিনীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল আবার :

"করতে কি তুমি ?"

"কি করতাম ?"

তাপস রুদ্রের স্বর একটু কেঁপে গেল।

"যা করতাম, তার ফল ত' এই দেখছ। এমন কিছু করতাম যার জন্যে মাকে মরতে হল। বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে মাকে আমার মেরে ফেললে।"

"কি সে কাজ ? কাজটা কি ?"

অতি বীভৎস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে ভাস্বতী :

"প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা।"

হালকা সুরে জবাব দিলে তাপস রুদ্র।

"মুদ্দাফরাশ কাদের বলে জান ? মুদ্দাফরাশের কাজ করতাম।

না না, ঠিক বলা হ'ল না কথাটা, মুদ্দাফরাশ ত' মড়াগুলোর ওপরে প্রতিশোধ নেয় না। মুদ্দাফরাশের চেয়ে জঘন্য কাজ কারতাম। সমাজের পচা গলা পোকা-থকথকে অংশটা সাফ করতাম। তাতে কারও কোনও কল্যাণ হত না, শুধু নিজের প্রতিহিংসা বৃত্তিটা একটু চরিতার্থ হত।"

থামল তাপস রুদ্র, মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

পিছতে শুরু করছে ভাস্বতী, তখনও সে ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাপস রুদ্রের দিকে। পিছতে পিছতে হিস হিস করে বলতে লাগল :

"তা'হলে তুমিই সেই অতি-মানব !"

মুখ ফেরালে না তাপস রুদ্র। মায়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলতে লাগল :

"দানব বল। বল, অতি দানব।...দানবের ক্ষমতা পেয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম আমি মানুষ, আমিও মায়ের পেট থেকে পড়েছি।...ক্ষমা ভুলে গিয়েছিলাম, দয়া ভুলে গিয়েছিলাম, স্নেহ প্রেম করুণা সব বিসর্জন দিয়েছিলাম। এই যে মা, মাকেও ভুলে গিয়েছিলাম। এই হিয়া, হিয়াকেও ভুলে গিয়েছিলাম।...কিছুই স্মরণ করতে পারতাম না, শুধু প্রতিহিংসা নেওয়ার নেশায় পাগল হয়ে ছিলাম। শুধু—"

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ভাস্বতী :

"পালিয়ে এলে কেন? প্রতিহিংসা নেওয়া কি শেষ হয়ে গেল? কেন নিজের কাজ শেষ করে এলে না? বিষাক্ত সাপকে খুঁচিয়ে দিয়ে না মেরে চলে এলে যে? এখন সেই সাপ যে মাথায় ছোবল মারবে।"

মুখ তুলল হিয়া। আকুল কণ্ঠে মিনতি করে উঠল :

"ক্ষমা, ভাস্বতী, ক্ষমা কর। এইমাত্র মা বলে গেলেন—"

"ক্ষমা! হা হা হা হা—"

পৈশাচিক হাসি জুড়ে দিল ভাস্বতী। পাগলের মত হাসতে লাগল, আর মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতে লাগল—"ক্ষমা, ক্ষমা—"

সেই উৎকট হাসির মধ্যে একে একে ঘরে ঢুকলেন শান্তনু রুদ্র, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ, শ্রীমতী চৌধুরী আর কল্যাণ। ভাস্বতীর ভয়ঙ্করী মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল বলে হিয়া বা তাপস রুদ্র ওঁদের আবির্ভাব টের পেল না। ঘরে ঢুকে শান্তনু রুদ্র সোজা এগিয়ে গেলেন সোফার কাছে। ইন্দুমতীর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর খুব নরম গলায় ডাক দিলেন :

"ইন্দু ওঠ। চল, বাড়ি যাই।"

বন্ধ হয়ে গেল ভাস্বতীর হাসি। হিয়া আর তাপস ঘুরে দাঁড়াল। সবাই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল রুদ্রমশায়ের দিকে! একটু সময় চুপ করে থেকে চুপি চুপি বলতে লাগলেন রুদ্রমশাই :

"ছিঃ, এমনভাবে রাগ করতে আছে!...রাগ করে কোথায় এসে শুয়েছ তুমি?...এই কি তোমার শোবার জায়গা? ওঠ লক্ষ্মীটি, চল আমরা পালাই এখান থেকে। কালই আমরা চলে যাব দার্জিলিং ছেড়ে। তুমি তোমার নিজের বাড়িতে যাবে।...আর আমি কখনও রাস্তায় কিছু খুঁজে বেড়াব না, কখনও তোমার মুখ হেঁট করব না, কখনও তোমায় চোর বলব না। চল ইন্দু চল, সবাই হাসবে যে। এখানে এমনভাবে শুয়ে থাকলে হাসাহাসি করবে যে সকলে! চল, আমরা পালাই এখান থেকে—"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন রুদ্রমশাই। তারপর অল্প একটু নুয়ে বলে উঠলেন :

"উঠবে না ইন্দু? শুনবে না আমার ডাক?"

দুর্জয় অভিমানে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।

কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল সকলেরই। সবাই নত মুখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সর্বপ্রথম নড়ে উঠল ভাস্বতী, পা টিপে-

টিপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে রুদ্রমশায়ের পাশে। ফিস্ ফিস্ করে বলল :

"আর জাগবে না, আর শুনতে পাবে না, আর—আর সাড়া দেবে না।"

রুদ্রমশাই মুখ তুলে তাকালেন ভাস্বতীর দিকে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

"কেন?"

কি জবাব দেবে ভাস্বতী, থতমত খেয়ে আবার পিছুতে লাগল।

জবাব দিলেন ভাস্বতীর মা। অতি বিষাক্ত স্বরে বলে উঠলেন :

"পালিয়ে গেছে যে। এই নরককুণ্ড জগতের মুখে লাথি মেরে পালিয়ে যেতে পেরেছে কি না, তাই আর কিছু শুনবেও না, কিছু বলবেও না।"

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন বন্ধুর পাশে। বললেন :

"শান্তনু, একটু স্থির হও ভাই। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। চতুর্দিকে ভয়ানক বিপদ, শত্রুরা হয়ত এখানে এসে তোমার উপরেও হামলা করবে।"

এতক্ষণ পরে নড়ে উঠল তাপস রুদ্র। মুখ তুলে তাকাল একবার বাপের পানে। মর্মভেদী স্বরে ডাক দিল :

"বাবা!"

চমকে উঠলেন রুদ্রমশাই। যেন জ্যান্ত যমকে দেখতে পেয়েছেন সামনে, এমনভাবে চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বললেন :

"কি দেখছ শান্তনু অমন করে? তাপস, তোমার ছেলে তপু ফিরে এসেছে।"

রুদ্রমশাই মুখ নিচু করে ফেললেন। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বললেন :

"ও, তুমি এসেছ! তোমার মা কি তাহলে তোমার কাছেই এসেছিলেন ?

হিয়া জবাব দিল :

"না, মা কোনও রকমে বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন আপনাকে সাবধান করতে। যারা মায়ের ওপর অত্যাচার করেছে, প্রধানজীকে মেরেছে, তারা আপনার জন্যে এখানেও আসতে পারে। এই ভয়ে মা কোনও রকমে এতদূরে পৌঁছেছেন।"

"ভালই করেছে, ভালই করেছে। তবু নিজের ছেলের সামনে মরতে পারলে। এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়!"

মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন রুদ্রমশাই। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে হাত পেতে বললেন :

"দাও, এবার সে জিনিসটা আমায় দিয়ে দাও। সেটা তোমার মায়ের সঙ্গে আমি পুড়িয়ে ফেলি। আপদ চুকে যাক।"

তাপস রুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

"নেই সে জিনিস। পুড়িয়ে ফেলেছি আমি নিজেই। পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু তাতেও তো ফল হল না। মাকে যে বাঁচাতে পারলাম না"

শান্তনু রুদ্র হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। কথাটা ঠিক বিশ্বাস করলেন না, বোঝা গেল না।

সকলের পেছন থেকে গর্জে উঠল কল্যাণ :

"নষ্ট করে দিয়েছেন সব জিনিস! তার মানে আর কেউ কারও শয়তানি জানতে পারবে না। শয়তানরা এখন আবার বুক ফুলিয়ে যা-খুশি করে বেড়াবে!"

প্রশান্তভাবে তাপস রুদ্র বলল :

"করুক, যার যা খুশি করুক। পৃথিবী থেকে শয়তানি লোপ পেলে পৃথিবীটা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হবে। শয়তান আছে বলেই

দেবতা আছে। শয়তানের শয়তানি ঘোচাতে গেলে দেবতার দেবত্বও এ তুনিয়ায় থাকবে না।”

“শয়তানের শয়তানি আর দেবতার দেবত্ব!”

হিস হিস করে উঠল ভাস্বতী। তারপর আবার সেই পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল :

“হা হা হা হা হা, দেবতার দেবত্ব আর শয়তানের শয়তানি! সব এক সঙ্গে এই পায়ের তলায় ফেলে নাচব তার ওপর। দেবতার দেবত্ব আর শয়তানের শয়তানি, এমনিভাবে, ঠিক এমনি করে তু' পায়ে দলে-পিষে···হা হা হা—”

“অতি অদ্ভুতভাবে তু'পায়ে আঘাত করতে লাগল কাঠের মেঝেয়। সেইভাবে নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ওরা সকলে সভয়ে তাকিয়ে রইলেন দরজায় টাঙানো বিচিত্র রঙের পর্দাখানার দিকে, যে পর্দাখানা ঠেলে বেরিয়ে গেল ভাস্বতী, সে পর্দাখানার গায়ে কয়েকটা ঢেউ উঠল। তারপর পর্দার ওপরের ঢেউগুলো আস্তে আস্তে থেমে গেল।

দার্জিলিং।

ফুলের রানী দার্জিলিং, রানীদের ফুল দার্জিলিঙে ফোটে। দার্জিলিঙের ম্যাল হল সেই ফোটা-ফুলের বাগান। সেই ম্যাল-বাগানে অজস্র ছবি বিলনো শুরু হল,—ফোটা ফুলের ছবি। পাপড়ি মেলেছে এক শ্বেত পদ্ম, গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে পাপড়িগুলো থেকে। সেই পদ্মের গর্ভে জেগে উঠেছে একটি স্বপ্ন। —হ্যাঁ, স্বপ্নই বটে! স্বপ্ন দিয়ে গড়া একখানি তনু আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মের গর্ভে। যেন সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে, ঘুম ভেঙেছে কিন্তু স্বপ্নের আবেশ তখনও কাটে নি, আঁখি দুটির চাহনি কেমন যেন এলিয়ে আছে স্বপ্নের আবেশে। স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নি বলেই পদ্মের পাপড়ির ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। নয়ত নিশ্চয়ই লজ্জা পেত অমনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে। আবরণ বলতে কিছুই নেই সেই তনুখানিকে ঘিরে, অতি উচ্চাঙ্গের চারুকলার নিদর্শন কয়েকটি আভরণে ঢাকা আছে তনু-খানির সামান্য অংশ। আভরণগুলো শুধু আভরণই নয়, সঙ্কেতও বটে। রহস্যময় সঙ্কেত, যে সঙ্কেত দর্শকের দৃষ্টিকেও রহস্যময় করে তোলে।

সেই ছবিখানির দিকে তাকিয়ে ফুলের রানীরা, যাঁরা প্রত্যহ সকালে বিকালে ম্যালে গিয়ে ফুল ফোটান, তাঁরা জোর করে নিঃশ্বাস চেপে ফেললেন।

অনেকের নিঃশ্বাস কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঘোড়াওয়ালা ভুটিয়ারা সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে তাদের মোটা মোটা ঠোঁট-গুলো বার বার চাটতে লাগল। ট্যাক্সীওয়ালারা নিজেদের মাথার রুক্ষ চুলগুলো খামচে ধরে অনর্থক টানাটানি করতে লাগল। পিয়ন বেয়ারা বয় বাবুর্চীরা সেই ফোটোওয়ালা কাগজ সংগ্রহ করে

তাদের ছেঁড়া জামার বুক পকেটে গুঁজে ফেললে। অনেক নিচে বাজারেও পৌঁছে গেল সেই ছবিওয়ালা কাগজ! যারা মাল বয়, যারা রাস্তা বানায়, যারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সেই সব রাস্তা টিকিয়ে রাখে, যারা হাসপাতালের মড়া টানে, আর যারা আরও নিচের তলায় চা বাগানে চা-পাতা ছেঁড়ে, সকলের কাছেই সেই ফোটো পৌঁছল। সকলের নিঃশ্বাসই বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ওপর দিকে মুখ তুলে সকলেই বার বার তাকিয়ে দেখলে দার্জিলিঙের মাথায়। গৌরীশৃঙ্গ হোটেলের চূড়া পর্যন্ত সেই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পৌঁছল কি পৌঁছল না, অনেকেই তা' বুঝতে পারল না।

প্রথম রজনী সমাসন্ন।

ফুল লতা পাতা আলো পতাকা দিয়ে অতি অপরূপ সাজে সাজানো হয়ে গেল গৌরীশৃঙ্গ হোটেলের সম্মুখভাগটা। প্লেনে মোটরে রেলে অজস্র অতিথি এসে জুটলেন দার্জিলিঙে। নাম যাঁদের আছে, নামের দাম যাঁরা বোঝেন, তাঁরা নামের উপযুক্ত দাম দিয়ে প্রবেশপত্র যোগাড় করে অনেক নিচে থেকে উঠে গেলেন অনেক ওপরে। পহেলা নম্বরের পান্থশালায় পহেলা নম্বরের ব্যবস্থা-মত তামাম দেশটার পহেলা নম্বরের একটি মানুষও উৎসবে যোগ দিতে ছাড়লেন না। দার্জিলিঙে তুষার-শীতল আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল।

প্রথম রজনী সমাসন্ন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না বিশ্ববন্দিতা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী ভাস্বতী দেবী বহুদিন পরে দার্জিলিং শৈলশিখরে তাঁর নবতম অবদান 'ক্ষমা-সুন্দরের জাগরণ' নিয়ে দেশের জ্ঞানী গুণী সজ্জনগণের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবেন। ভারত-বিখ্যাত ধ্রুপদী পণ্ডিত নীলকণ্ঠ 'ক্ষমা-সুন্দরের' আবাহন গান গাইবেন। তাঁর কন্যা শ্রীমতী

হিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতে রূপদান করবেন—'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা ক'রো না।' সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন কথাসাহিত্যিক শ্রীশান্তনু রুদ্র,—একদা যিনি মানুষের মনের ভেতরের দেবতা ও শয়তানকে কাগজের ওপর সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতেন কথার পিঠে কথা সাজিয়ে। বহুকাল পরে সেই শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী বক্তৃতা দেবেন। বিষয়—'পূজা কার। দেবতার না শয়তানের!'

প্রথম রজনী সমাসন্ন।

সুন্দরী দার্জিলিং সুন্দরের পূজার উপযুক্ত সাজে সজ্জিতা হল। দূরে দাঁড়িয়ে তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা সভয়ে তাকিয়ে রইল সুন্দরী দার্জিলিঙের পানে। আর গলতে লাগল।

তারপর সত্যই এক সন্ধ্যায় সমাগত হল প্রথম রজনী আশা-যবনিকার অন্তরাল থেকে। মহাসম্ভ্রান্ত গৌরীশৃঙ্গ পান্থশালার নাচঘরে সমবেত হলেন মহামর্যাদাশালী অতিথিরা তাঁদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে। নাচঘরের মধ্যে অতি অলৌকিক আলোছায়ার খেলা, ঘন কুয়াশার মধ্যে ডুবে আছে যেন সমস্ত নাচঘরটি। সেই কুয়াশার মধ্যে সবই দেখা যায়, কিন্তু কিছুই খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। লম্বা নাচঘরটার এক প্রান্তে প্রবেশ-দ্বার, অপর প্রান্তে ছোট্ট একটু রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত বিচিত্র রঙের কার্পেটে ঢাকা পথ। সেই পথের দু'ধারে ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চারখানি করে চেয়ার সাজানো হয়েছে। টবসুদ্ধ ফুলের গাছ অদ্ভুত কায়দায় বসানো হয়েছে মাঝে মাঝে, যাতে এক টেবিল থেকে অপর টেবিলে নজর না যায়। কোথায় কি উপায়ে যে আলো দেওয়া হয়েছে, তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আলো আছে, এটুকু বেশ বোঝা যায়। হেঁয়ালির মত আলোর আভা ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তাতে অন্ধকারটা আরও

প্রহেলিকাময় হয়ে উঠেছে। ব্যবস্থাটা আত্মগোপনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। পাছে অতিথিরা একে অপরকে চিনতে পেরে শিউরে ওঠেন, এই ভয়েই বোধ হয় অমন আলো-আঁধারের রহস্য সৃজন করা হয়েছে।

সেই আলো-আঁধারের অন্তরে গুমরে গুমরে উঠছে আঁধির অন্তর্বেদনা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ফুঁসিয়ে উঠছে, আবার ঝিমিয়ে পড়ছে পাতালপুরের সঙ্গীত। সত্যিই সেই সৃষ্টিছাড়া সঙ্গীত যেন পাতালপুর থেকে উঠে আসছে নাচঘরের মধ্যে। প্রকাণ্ড মাপের প্রচণ্ড ভারী প্রবেশদ্বারটা বার বার খুলছে আবার নিজে থেকে বন্ধ হচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় অতিথিরা আবির্ভূত হচ্ছেন এবং পাতালপুরের অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গিনী-বিহীন অবস্থায় কেউ কেউ ঢুকছেন। ঢুকে এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে ভেতরে চলে যাচ্ছেন। কয়েকজন কিন্তু ভেতরে গেলেন না, দরজার একপাশে জমতে লাগলেন। জমতে জমতে জমে উঠলেন পাঁচ সাতজন। এমনিই আর কি, এমনিই দাঁড়িয়ে পড়লেন, দাঁড়িয়ে একটু ধূমপান করতে লাগলেন তাঁরা। ধূমপানটা সমাপ্ত করেই ভেতরে গিয়ে বসবেন। ততক্ষণে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে যাবে।

ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনাও চলতে লাগলো। ইশারা ইঙ্গিতেই চলল আলাপ, অন্য কেউ তাঁদের আলোচনায় যোগদান করেন এটা যেন তাঁরা চান না।

মুখে কুচ কুচে কালো চাঁপদাড়ি, মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ি এক দীর্ঘ দেহ পুরুষ ধূমপান করছিলেন না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দরজার দিকে। যাঁরা প্রবেশ করছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি চেনবার চেষ্টা করছিলেন দূরে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি যেন নিরাশ হয়ে পড়লেন। চুমকুড়ি দিয়ে চাপা গর্জন করে উঠলেন:

"না, এলো না দেখছি। চিড়িয়া ফাঁদে পড়ল না।"

মাথা-জোড়া চকচকে টাক, ফুটবলের মত গোল টকটকে লাল মুখ এক সাহেব চুরুট চিবতে চিবতে বললেন :

"আসবেই, বা ইতিমধ্যে এসেই গেছে। যাবে কোথায় জাদুমণি, তাঁর হিয়ার সঙ্গীত না শুনে যাবে কোথায়!"

খুব মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, বিশাল ভুঁড়িওয়ালা, ধুতি পরা শাল জড়ানো এক ভদ্রলোক মিহি সুরে বললেন :

"ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখে নি এখনও।"

সকলের চেয়ে খাটো আবলুস-বর্ণ এক সাহেব নিজের হাত দু'খানা নিয়ে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। দু'হাত কচলাতে কচলাতে অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করলেন তিনি :

"নো এস্কাপা দিস্ চান্সা। মাস্ট ফিনিস দিস্ টাইম্।"

কপালের চেয়ে থুতনিটা অন্ততঃ ইঞ্চি দুয়েক সামনে এগিয়ে আছে, নাকটা অসম্ভব রকম চওড়া, মাথার চুলগুলো খাড়া, সর্ব-শরীর যেন শুধু কয়েকটা গাঁটের সমষ্টি, এমন একজন সাহেব নাকিসুরে বললেন :

"লেফ্ট হ্যাণ্ডের একটি কাট্ চোয়াল ঘেঁসে—ব্যাস—"

কথা ক'টা বলে তাঁর অত্যন্ত খাটো বাঁ হাতখানায় একটা ঝাঁকি দিলেন।

চাঁপদাড়ি চাপা সুরে ডাক দিলেন :

"পন্থজী কোথায়? আখেরী পন্থ কোথায় গেল?"

এক সুদর্শন ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এলেন। বাবড়ি আছে ভদ্রলোকের, পরে আছেন ধুতির ওপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট। ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা থিয়েটারের অভিনেতার মত। আলগাভাবে ঠোঁটে আটকে রয়েছে একটা জলন্ত সিগারেট। সামনে এসে বললেন :

"ইয়েস—"

চাঁপদাড়ি হিংস্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন :

"আসছে না যে?"

বাবরি চোখ কুঁচকে বললেন:

"আসবে, সিওর। হিয়ায় চোট্ পড়লেই বোঝা যাবে এসেছে কি না। গান আরম্ভ হোক আগে।"

ভুঁড়িওয়ালা বললেন:

"সব ঠিক আছে তো?"

থুতনিওয়ালা জবাব দিল:

"সিওর"

"তা' হলে এখন আমরা বসে পড়তে পারি। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না!"

বললেন চকচকে টাক।

"কিন্তু এখানে কে থাকবে? দরজা আটকাবে কে?

জানতে চান চাঁপদাড়ি।

আবলুসবর্ণ সাহেব হাত কচলাচ্ছিলেন তখনও! বললেন:

"নো ফিয়ার, দ্যাট্সা ডিপেণ্ডা অন্ মি।"

আখেরী পন্থ বাঁকা চোখে জিজ্ঞাসা করলেন:

"কি আছে? কি এনেছ সঙ্গে?"

"নাথিং, ওন্লি দিস্।"

বলে হাতের পাঞ্জা তুলে লাড়ু দেখাবার মত করলেন দক্ষিণী সাহেব। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

সেই মুহূর্তে দরজাটা আবার দুলে উঠল। চার পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রবেশ করলেন সভাপতি শান্তনু রুদ্র। বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ভদ্রলোকেরা সভাপতিকে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকেদের মধ্যে প্রিন্স অফ্ খাগড়াজোল আর লর্ড অফ্ মিয়েরবেড়কে চেনা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ওদের দু'জনেরই ডান হাত নিজের নিজের পকেটে ঢোকানো রয়েছে।

খাগড়াজোল প্রিন্স ঠিক রুদ্রমশায়ের সামনে রয়েছেন,

মিয়েরবেড় রয়েছেন ঠিক পেছনে। মনে হল, দু'জনেই যেন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে রয়েছেন। যেন দুটো উচ্চশ্রেণীর শিকারী কুকুর। এতটুকু শব্দ, এতটুকু নড়াচড়া কোনও দিকে হলেই তৎক্ষণাৎ শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

অনেকটা বুড়ো হয়ে পড়েছেন যেন রুদ্রমশাই। দরজার মাথার অত্যুজ্জ্বল আলোয় অনেক বেশী সাদা দেখাল তাঁর চুলগুলোকে। চলার ধরণটা খুবই অসহায় গোছের। যেন তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মোটে তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই। মাথা নিচু করে ভয়ানক অন্যমনস্কভাবে চললেন এগিয়ে। দু'পা গিয়েই থামলেন। মুখ তুলে চতুর্দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন! কেমন যেন একটা বিশ্রী পোড়া পোড়া গন্ধ!"

পেছন থেকে মিয়েরবেড় বলে উঠলেন ঃ

"আসবেন না এখানে। সময় হয়ে গেছে, দয়া করে এগিয়ে চলুন।"

সামনে থেকে খাগড়াজোল বললেন ঃ

"এগ্ জ্যাক্টলি—আসুন। চলে আসুন।"

দু'পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আরও নিবিড়ভাবে ঘিরে ফেললেন রুদ্রমশাইকে।

গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল রুদ্রমশায়ের। বললেন ঃ

"চলুন, এগিয়েই চলুন। যেতেই ত' হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ওরা কোথায়? মিসেস্ চৌধুরী—কল্যাণ—"

কেউ ওঁর কথার উত্তর দিলে না।

ওঁরা এগিয়ে গেলেন আরও ভেতরে।

এঁরাও ততক্ষণে মিলিয়ে গেছেন আলো আঁধারের মধ্যে।

শুধু সেই বাবরিওয়ালা থিয়েটারি ঢঙের ভদ্রলোকটি গেলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে সিগারেটে শেষ টান দিতে লাগলেন।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সেই আবলুস-বর্ণ দক্ষিণী পকেট থেকে একটি ভীমদর্শন চুরুট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

রঙ্গমঞ্চ।

রঙ্গমঞ্চ একখানি মেঘবরণী পর্দার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। মেঘমন্দ্র সুরে মৃদঙ্গের ধ্বনি ভেসে আসছে মেঘবরণী পর্দার অন্তরাল থেকে। তার সঙ্গে তালে তালে বাজছে মন্দিরা। মৃদঙ্গ আর মন্দিরায় মিলে যে নাদ সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে প্রত্যেকটি বুকের মধ্যে তোলপাড় উঠেছে। প্রত্যেকে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছে মেঘবরণী পর্দাখানার দিকে।

হঠাৎ ঝপ করে খসে পড়ল পর্দাখানা। সঙ্গে সঙ্গে সকলের নজরে পড়ল, মস্ত একখানা লাল ভেলভেটের গায়ে আঁকা বড় একটা ঈগল পাখীর ওপর। ঈগল পাখীটার ঠোঁটে একটি মানুষের বাচ্চা ধরা রয়েছে। ঠোঁটে করে মানুষের বাচ্চা ধরে নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে পাখীটা। সোনালী জরি দিয়ে আঁকা রয়েছে পাখীটা লাল ভেলভেটের গায়ে, মানবশিশুটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রুপালী জরি দিয়ে। সেই পাখী-আঁকা ভেলভেটখানাই হল পটভূমিকা। ঐ পটভূমিকার সামনে আবির্ভূতা হবেন বিশ্ববন্দিতা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী ভাস্বতী দেবী। নৃত্যের দ্বারা জাগাবেন তিনি ক্ষমাসুন্দরকে। জেগে উঠে ক্ষমাসুন্দর বোধ হয় ঐ নিষ্ঠুর পাখীটার ঠোঁট থেকে মনুষ্যশাবকটিকে রক্ষা করবেন।

কোন্ সময় যে মৃদঙ্গ আর মন্দিরা বন্ধ হয়ে গেছে, তা কারও খেয়ালই হয় নি। চমকে উঠলেন সকলে অতি তীব্র মুরলীধ্বনি শুনে। মুরলী যেন আকুল স্বরে কাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

মুরলীধ্বনি ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে রঙ্গমঞ্চের আলোর উজ্জ্বলতাও কমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একেবারে

আঁধার হয়ে গেল রঙ্গমঞ্চ। নেপথ্য থেকে ঘোষণা করা হল নারীকণ্ঠে—

জাগো—

ক্ষমাসুন্দর হে—

জাগো—

ঘোষণাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগীয়ার করুণ রাগিণী মূর্ত হয়ে উঠল সারঙ্গীতে। সেই সঙ্গে উড়ন্ত ঈগলটির তলায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনের আভার মাঝখানে দেখা দিল একটি পদ্ম। পদ্মটি ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে। দেখতে দেখতে আগুনের আভা ফিকে হয়ে গেল, যোগীয়াও মিলিয়ে গেল লাল আলোর সঙ্গে। পদ্মটিকে ঘিরে শুভ্র জ্যোতি ফুটে উঠল। ক্রমেই বাড়তে লাগল সেই জ্যোতি, জ্যোতির সঙ্গে তাল রেখে ক্রমেই বাড়তে লাগল অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র ঝংকার। ঘুম ভাঙছে, সুরের ঝংকারে শ্বেত পদ্মের ঘুম ভাঙছে। পদ্মের পাপড়ির মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগছে।

হঠাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল রঙ্গমঞ্চ। তখন সকলের নজর পড়ল, পদ্মের ঠিক মাঝখানে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে—'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা' স্বপ্নময়ী এক সুরাঙ্গনা। রহস্যময় সঙ্গীত শুরু হল, সেই সঙ্গীতের স্পর্শ লেগে বার বার শিহরিত হল সুরাঙ্গনার নগ্নকান্তি। তার পর সেই তনুখানি পদ্ম থেকে নেমে এল, দুলতে লাগল সঙ্গীতের তালে তালে! তখন একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় ছাড়া আর কোনও ইন্দ্রিয়ই কারও সজাগ রইল না। কত বার কত রকমে সুর তাল লয় পালটাল, নেপথ্য সঙ্গীত চলল কি চলল না, সেদিকে কারও খেয়ালই রইল না।

অকস্মাৎ শানায়ের তীব্র সুর কানে যাওয়াতে প্রত্যেকের চোখ কান মন ত্রস্ত হয়ে উঠল। আড়ষ্ট হয়ে দেখল সকলে, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেমে আসছে জীবন্ত ছন্দের হিল্লোল। স্বপ্ন দেখতে লাগল

সবাই, স্বপ্নের পথে ভেসে যায় স্বপ্নময়ী সুরসুন্দরী। শানায়ে ভৈরবী ঠুংরির আলাপ চলছে তখন। শানায়ের সুরের সঙ্গে মিশে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেল ভৈরবী ঠুংরি প্রবেশদ্বারের কাছে। সকলের চোখের সামনে দিয়ে মাঝখানের পথ ধরেই গেল। কেউ বাধা দিতে পারলে না। সবিস্ময়ে সবাই দেখল প্রকাণ্ড দরজাটা একটু দুলে উঠল। পরমুহূর্তে স্বপ্ন টুটে গেল সকলের। ভৈরবী ঠুংরি আর নেই।

"সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ—"

চমকে উঠে সকলে ফিরে তাকাল রঙ্গমঞ্চের দিকে। রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকা বদলেছে। যেখানে ছিল সোনালী রঙের ঈগল পাখী সেখানে একখানি চকচকে কালো পর্দা ঝুলছে। পর্দায় পিঠ ঠেকিয়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে আছেন সভাপতি শান্তনু রুদ্র। স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ শান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ধীরে ধীরে আর এক বার সম্বোধন করলেন তিনি ঃ

"সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ,"

সম্বোধন করে একটি ঢোঁক গিললেন। অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন এক বার সামনে। তার পর আবার আরম্ভ করলেন ঃ

"আজ আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠান ক্ষমাসুন্দরের জাগরণ দিয়ে শুরু হল। দুঃস্বপ্ন আর নেই, দুর্যোগ-নিশার অবসান হয়েছে। চিরসুন্দরের পূজারী মানুষ, ক্ষণিকের ভুলে অসুন্দরের নেশায় মেতে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিল। এই শুভ মুহূর্তে আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করছি, মানুষ আবার তার আত্মজ্ঞান ফিরে পেয়েছে। আর ভয় নেই। মানুষ আর মানুষ-শিকারের নেশায় ক্ষেপে উঠবে না। কাউকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না। মানুষ আবার ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে-যাওয়া শক্তি।

যুগ-যুগান্ত ধরে তপস্যা করে সেই শক্তি অর্জন করেছিল মানুষ। শয়তানের চক্রান্তে হঠাৎ সে শক্তিটি হারিয়ে বসেছিল মানুষ। সেই শক্তিই হল একমাত্র শক্তি, যা মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনও প্রাণীর নেই। সেই শক্তিটিই মানুষের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছে মানুষে। সুতরাং এই অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করা হল, আর ভয় নেই। ভয় অবিশ্বাস ঘৃণাকে জয় করে মানুষ আবার চিরসুন্দরের পূজায় আত্মসমর্পণ করেছে। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে—"

"শাট্ আপ!"

বজ্রনির্ঘোষে চেঁচিয়ে উঠল কে অন্ধকার হলের ভেতর থেকে। সেই মুহূর্তে রুদ্রমশায়ের পেছনের পর্দা সরিয়ে খাগড়াজোল প্রিন্স আর মিয়েরবেড় লর্ড সামনে এসে দাঁড়ালেন। এমনভাবে দাঁড়ালেন তাঁরা যে রুদ্রমশাই প্রায় ঢাকা পড়ে গেলেন।

আবার একটা গর্জন উঠল হলের ভেতর থেকে ঃ

"কে তোমায় অধিকার দিয়েছে এই ঘোষণা করবার?"

হঠাৎ অদ্ভুত কাণ্ড দেখে হলসুদ্ধ মানুষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এইবার সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল ঃ

"আলো, আলো জ্বালাও, লাইট প্লীজ।"

চোখ-ধাঁধানো আলোয় হলটা ভেসে উঠল। দেখা গেল, মাঝখানের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক সুদর্শন ভদ্রলোক। বাবরি আছে তাঁর, লম্বা কোট আর ধুতি পরে আছেন। ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা থিয়েটারের অভিনেতার মত। আলো জ্বলবার পরে দস্তুরমত অভিনয়ই আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক। তেড়ে গিয়ে পৌঁছলেন রঙ্গমঞ্চের সামনে, পৌঁছেই সর্বসাধারণের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার পর আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা ঃ

"লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেল্‌মেন,

প্রথমে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনাদের বিরক্ত

করেছি বলে। ক্ষমা চেয়ে আপনাদের কাছে একান্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে, মানে আপনাদের সভাপতি মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, এইমাত্র উনি যে আশ্বাস দিলেন আমাদের, সে আশ্বাস উনি কিসের জোরে দিলেন। আপনারা সবাই জানেন, সমাজে এমন এক জন পিশাচ লুকিয়ে আছে—যে নাকি মানুষের মনের ছবি তোলার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। সেই পিশাচের দাপটে থরথর করে কাঁপছেন দেশের শাসকগোষ্ঠী। তার ভয়ে অতি জঘন্য আইন বানাতে হয়েছে। অপরাধী অপরাধ স্বীকার করলে তাকে জনতার হাতে তুলে দিতে হবে। কয়েক জনকে দেওয়াও হয়েছে। ফল যা হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি। সেই নিদারুণ লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় বহুলোক আত্মহত্যা করে ফেলেছেন।—আমি জানতে চাচ্ছি, সেই নরপিশাচ কোথায় আছে? কি তার পরিচয়? আপনাদের সভাপতির সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি? তার সঙ্গে পরামর্শ করে কি তিনি আমাদের ক্ষমাসুন্দরের আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন?···বলুন উনি, স্পষ্ট ভাষায় আমার কথার জবাব দিন।"

নিস্তব্ধ হল নাচঘর কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার পর একসঙ্গে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হল:

"জবাব দাও, স্পষ্ট করে জবাব দাও।"

জবাব দেবার জন্য সামনের দু জনকে ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইলেন রুদ্রমশাই, পারলেন না। পারবার দরকারও হল না। রঙ্গমঞ্চের ওপর আবির্ভূত হল তাপস রুদ্রের দীর্ঘ মূর্তি, তখনও সেই ফেল্ট হ্যাট আর লম্বা ওভারকোট পরে আছে সে। তখনও তার ভুরু পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে।

রঙ্গমঞ্চের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা খুলে ফেললে সে। টুপিটা এক হাতে নিয়ে অনেকটা নুয়ে সকলকে সম্মান জানালে। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত গলায়

বলে উঠল : "আমিই সেই নরপিশাচ। দিন, কি শাস্তি দেবেন আপনারা, দিন আমাকে। আমার শাস্তি আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। এর পর যেন শান্তি ফিরে পায় দেশের মানুষ। দেশ থেকে দুর্নীতি অনাচার যেন ঘোচে। মানুষকে মানুষের ভয়ে ভীত হয়ে আর যেন লুকিয়ে বেড়াতে না হয়।"

"দুড়ুম্ দুড়ুম্।"

কোথায় যেন রাইফেল গর্জে উঠল। দু বার সেই আওয়াজ মিলোতে না মিলোতে প্রবেশদ্বারটা সজোরে খুলে গেল। ছিটকে পড়ল ভাস্বতীর নগ্ন দেহটা হলের মধ্যে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল রঙ্গমঞ্চের ওপর। তাপস রুদ্রকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পাগলের মত হাসি জুড়ে দিল—হা হা হা হা হা হা।

আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এল ভাস্বতী।

চিরবঞ্চিত চিরবুভুক্ষিতদের বুকের মধ্যে যে আগুন অনির্বাণ জ্বলে, সেই আগুনের মুখের জগদ্দল চাপাটা সরিয়ে দিয়ে এল। যে ছবিখানি রাস্তায় রাস্তায় বিলানো হয়েছিল, সেই ছবি জ্যান্ত হয়ে রক্ত-মাংসের রূপ নিয়ে ছুটে বেরোল গৌরীশৃঙ্গ হোটেল থেকে খোলা আকাশের তলায়। দেখল তাকে,—চাক্ষুষ দেখতে পেল, ঘোড়াওয়ালারা, ট্যাক্সিওয়ালারা, মাংসওয়ালারা, বয়-বাবুর্চী, খিদ্‌মদ্‌গার সবাই দেখল। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল হোটেলের সামনে। সুরসভাতলে প্রবেশের সামর্থ্য না থাকার দরুন সুরসভার বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল সকলে। আর ধিকিধিকি জ্বলছিল বুকের মধ্যে জগদ্দল-চাপা আগুন! হঠাৎ তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল, চাক্ষুষ দেখল তারা সুরসভার উর্বশীকে তাদের মাঝখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে। তখন তারাও আত্মহারা হয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে প্রথমে ম্যাল, তার পর বাজার, তার পর

আবার গৌরীশৃঙ্গ হোটেলের দিকেই ফিরল উর্বশী। তখন সহস্র মানুষ দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে তার পেছনে। গৌরীশৃঙ্গের দরজায় পৌঁছে নিমেষের জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। তার পর ঢুকে পড়ল দরজার মধ্যে! বিশাল কপাট দুখানা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হল সকলের মুখের ওপর। চিরবঞ্চিতের দল দুর্জয় ক্ষোভে ফুলতে লাগল।···এ কি রকম নির্লজ্জ প্রতারণা!

হোটেলের সান্ত্রী তার অস্ত্রটাকে কাজে লাগাবার এ হেন সুযোগ আর ছাড়তে পারল না। আশা করেছিল যে ফাঁকা আওয়াজ করলেই ওরা পালাবে, কারণ চিরকাল ওরা পালাতেই অভ্যস্ত। আকাশের দিকে রাইফেলের মুখ করে ঘোড়া টিপল সে। দুড়ুম দুড়ুম দুটো আওয়াজ হল। ব্যাস্, আর দেখতে হল না, বিশাল জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল হোটেলের ওপর। মানুষের হাতে-গড়া সভ্যতার সুউচ্চ দুর্গ মানুষের হাতের চাপে গুঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

দার্জিলিং, ঠাণ্ডার দেশ দার্জিলিং, বরফের দেশ দার্জিলিং।

দার্জিলিং শহরে উত্তাপের বড় অভাব। কয়লা সেখানে পাঁচ টাকা মন। বিজলীর তাপ গ্রহণ করার সৌভাগ্য কটা লোকের আছে সেখানে! কাজেই দার্জিলিঙে মানুষ আগুন-বিনা শীতে কেঁপে মরে। আর বরফ মুড়ি দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসে।

সে রাত্রে কিন্তু ঠাণ্ডা ছিল না দার্জিলিং শহরে। প্রচুর আগুন, লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে।···পুড়ছে, সব পুড়ছে। আভিজাত্য পুড়ছে, অহংকার পুড়ছে, আত্মপরায়ণতা আত্মশ্লাঘা সমস্ত পুড়ে ছাই হচ্ছে। ওপরের আগুনে নীচের মানুষরা মনের সুখে তাপ নিচ্ছে।···দার্জিলিং শহরের সবচেয়ে আরামের রাত্রি,— সেই রাত্রি। সেই রাত্রে দাজিলিঙের মানুষের কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল, শীতে কেউ ঠকঠক করে কাঁপছিল না।

গৌরীশৃঙ্গ হোটেলের সামনেটা পুড়ছে। দুর্গন্ধে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস। মানুষ-পোড়া গন্ধ, সুবাসিত প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে যারা আজন্ম লেপেছে নিজেদের শরীর, তাদের শরীর পুড়তেও দুর্গন্ধ বার হল। আশ্চর্য!

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন জ্বলন্ত হোটেলটার দিকে শান্তনু রুদ্র। আদুড় শরীর তাঁর, জামা নেই, শাল নেই, সভাপতির খোলস কোথায় হারিয়ে গেছে। আধপোড়া কাপড়খানা জড়ানো রয়েছে কোমরে, মাথার চুলগুলোও যেন পুড়েছে কিছু কিছু। কালো ছাই মুখে মাথায় সর্বাঙ্গে লেপটে গেছে। রুদ্রমশাই হাঁ করে তাকিয়ে আছেন জ্বলন্ত হোটেলটার দিকে। তাকিয়ে আছেন, মাথা নাড়ছেন, আর মনে মনে কি যেন বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন।

ছুটে এসে উপস্থিত হল কল্যাণ। তার অবস্থাও আধপোড়া। শার্ট, তার ওপর পশমী গেঞ্জী পরে আছে সে। দুই-ই পুড়েছে পিঠের কাছে। ফলে দগদগে লাল পিঠ দেখা যাচ্ছে! ছুটে এসে দু হাতে জাপটে ধরল রুদ্রমশাইকে কল্যাণ। ধরে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাতে লাগল :

"চলুন, পালিয়ে চলুন এখান থেকে। এখনই ঐ জ্বলন্ত বাড়িটা ভেঙে পড়বে।"

বিন্দুমাত্র চমকালেন না রুদ্রমশাই। ধীরে সুস্থে নিজের দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে কল্যাণের কবল থেকে মুক্ত করলেন। মুক্ত করে এক পা পিছিয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে। আর এক বার কল্যাণ চিৎকার করে উঠল :

"আসুন, শিগ্‌গির আসুন। ভেঙে পড়ল বলে ওটা।"

রুদ্রমশাই নড়লেন না। ভয়ানক রকম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

"পালাব! সে কি! আমি যে সভাপতি। সভাপতির কি সভা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত!"

খেপে উঠল কল্যাণ। রুদ্রমশায়ের একখানা হাত ধরে প্রচণ্ড ভাবে ঝাঁকাতে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে আকুল আর্তনাদ—

"কি আজে-বাজে বকছেন এখন? সভা কোথায়? সব জ্বলছে। এক প্রাণী বেঁচে নেই আপনার সভার। হয় কচুকাটা হয়েছে— নয় তো আগুনে পুড়েছে। চলুন শিগ্‌গির, নয় তো ঐ আগুনে আমরাও পুড়ব।"

রুদ্রমশাই যেন মহা সন্তুষ্ট হলেন সুসংবাদটি শুনে। প্রসন্ন হাসিতে তাঁর ছাইমাখা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগলেন :

"চমৎকার অতি চমৎকার! সভাটা জ্বলে উঠল। আ-হা-হা-হা!

এমন বক্তৃতা দিলাম আমি যে সভায় অগ্নিকাণ্ড লেগে গেল। যার নাম অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা। আ-হা-হা-হা!”

কল্যাণ বুঝল, কথায় কোনও কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। শেষ চেষ্টা করল সে তখন। আবার দু হাতে জড়িয়ে ধরল রুদ্রমশায়কে। ধরে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

কয়েক মুহূর্ত চলল সেই ধস্তাধস্তি। শেষে সজোরে এক ঝটকা মারলেন রুদ্রমশাই, কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল কল্যাণ। পড়ে আর উঠতে পারল না, উবুড় হয়ে পথের ওপর মুখ ঘষতে লাগল।

রুদ্রমশাই হাঁপাতে লাগলেন জ্বলন্ত হোটেলটার দিকে তাকিয়ে। তার পর এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন তিনি। দু হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে দেহটাকে কোনও ক্রমে খাড়া করার চেষ্টা করছে তখন কল্যাণ। রুদ্রমশাই তেড়ে গিয়ে এক পা তুলে দিলেন কল্যাণের পিঠের ওপর। কল্যাণের ওঠবার চেষ্টা করা শেষ হল। সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রুদ্রমশাই বক্তৃতা জুড়ে দিলেন।

“সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ!

এই দেখুন, ঠিক এই ভাবে, ঠিক এই রকম করে পায়ের তলায় চেপে ধরতে হবে কল্যাণকে। কল্যাণের বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে এই মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে হবে। এই যজ্ঞের হবি হল মানুষের মনুষ্যত্ব, যে মনুষ্যত্ব মানুষকে ষোল আনা সর্বনাশের দিকে এগোতে দেয় না। মনুষ্যত্বটুকু পূর্ণাহুতি দেবার পরে মানুষকে আর মানুষ বলে চেনাই যাবে না। সেই মনুষ্যত্বহীন মানুষই পারবে এই ভাবে কল্যাণের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্নীতির সঙ্গে লড়াই করতে। দয়া মায়া পাপ পুণ্যের ভয় বিন্দুমাত্র যার থাকবে, ভবিষ্যতের চিন্তা তিলমাত্র যার মনে উদয় হবে, এই কল্যাণের মোহ, কল্যাণের মায়াকান্না যার বুকের মধ্যে এতটুকু কাঁপন জাগাবে, সে কখনও পারবে না সর্বধ্বংসী এই মহাযজ্ঞের

পূর্ণাহুতি দিতে। এই মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির পর জন্ম লাভ করবে যে সমাজ, সেই সমাজে দুর্নীতি থাকবে না, ব্যভিচার থাকবে না। মানুষে মানুষের সর্ব্বনাশ করার সুযোগ খুঁজবে না সেই সমাজে! এই সভায় আমরা সক্ষম হয়েছি এই মহা-যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করতে। এই সভার সভাপতি আমি, আমি এই যজ্ঞের প্রধান যাজ্ঞিক। সর্বপ্রথম আমি পূর্ণাহুতি দেব। আমি আমার মনুষ্যত্বের সঙ্গে পায়ের তলার এই কল্যাণকে এই যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দেব।"

রুদ্রমশায়ের বক্তৃতা শেষ হবার আগেই ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্‌ভ্রান্ত গোছের অবস্থা তাঁর। সাজসজ্জা পোড়ে নি বটে, কিন্তু কালিঝুলিতে এমনভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাঁর আপাদমস্তক যে তাঁকে চেনাই যাচ্ছে না। পণ্ডিতজী টাল সামলালেন রুদ্রমশায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। পরমুহূর্তে চিনতে পারলেন রুদ্রমশাইকে। আঁতকে উঠলেন একেবারে ঃ

"এ কি! শান্তনু! শান্তনু তুমি—"

কথাটা শেষ করতে দিলেন না পণ্ডিতজী, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন রুদ্রমশায়ের মুখের দিকে। রুদ্রমশাইও ঘাড় বেঁকিয়ে রুদ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চিরকালের বন্ধুর দিকে। যেন চিনতেই পারলেন না বন্ধুকে, যেন কস্মিনকালেও দেখেন নি মানুষটিকে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত কারও বাক্যস্ফূর্তি হল না। ক্রমে পণ্ডিত নীলকণ্ঠের দৃষ্টি রুদ্রমশায়ের মুখের ওপর থেকে পায়ের দিকে নামতে লাগল। পায়ের তলায় দৃষ্টি পড়তেই আর এক বার তিনি আঁতকে উঠলেন ঃ

"ও কি! ও কে পায়ের তলায়!"

রুদ্রমশাই জবাব দিলেন না।

চিৎকার করে উঠলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ ঃ

"কি করছ শান্তনু ? একটা মানুষের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে ! পা সরিয়ে নাও শিগ্‌গির, শিগ্‌গির পা নামাও ! কে ও ! মরে গেছে নাকি !"

এক চুল নড়লেন না রুদ্রমশাই। বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগলেন ঃ

"এই কল্যাণ, কল্যাণের ওপর পা দিয়ে আমি আমার অভি-ভাষণ দান করছি। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী—আপনারা দেখুন—কেমন করে কল্যাণকে এই মহাযজ্ঞে আমি পূর্ণাহুতি দিচ্ছি। এই কল্যাণ পায়ে পায়ে বাধা দেয়, পেছনে টানে, কিছুতেই মানুষকে মনুষ্যত্ব বর্জন করতে দেয় না। মনুষ্যত্ব বর্জন করতে না পারলে দুর্নীতি ব্যভিচার ঘুষ ভেজাল ধরাধরিকে সমাজের শরীর থেকে কিছুতে মুছে ফেলা সম্ভব নয়—"

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ হাঁ করলেন কি বলার জন্যে,—বলা হল না। দূর থেকে শোনা গেল বুক-ফাটা ডাক ঃ

"ভাস্বতী, ভাস্বতী রে—"

চমকে উঠলেন দু জনেই। দু জনেই তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে, যে দিক থেকে ডাকটা এল। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হল না, আবির্ভূতা হলেন ভাস্বতীর মা। মিসেস্ আতুরী চৌধুরী নয়, সত্যিই ভাস্বতীর মা এসে উপস্থিত হলেন। মিসেস্ চৌধুরীর সাজ-পোশাক কিছুই নেই, সব পুড়ে গেছে। আধপোড়া একটা জামা আছে গায়ে, কোমরে জড়ানো আছে এক টুকরো পোড়া কাপড়। মুখ পুড়েছে, চুল পুড়েছে, পুড়েছে আভিজাত্যের অভিশাপ তাঁর শরীরের ওপর থেকে। পুড়ে ভেতর থেকে ষোল আনা খাঁটী এক মা বেরিয়ে পড়েছে।

ওঁদের কাছাকাছি উপস্থিত হয়ে আকুল আর্তনাদ করে উঠলেন সেই মা ঃ "ওগো—তোমরা কেউ আমার মেয়েকে দেখেছ ?"

দু জনার কারও মুখ থেকে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

আর এক বার চিৎকার করে উঠলেন ভাস্বতীর মা :

"ওগো—বলতে পার কোথায় গেল আমার মেয়ে ?"

বৃথা জিজ্ঞাসা,—যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁরা দু জনেই বোবা হয়ে গেছেন। বোবা হয়ে গিয়ে ভীতিবিহ্বল চক্ষে তাকিয়ে আছেন সেই ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্তির দিকে। আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেন না ভাস্বতীর মা। ঘাড় হেঁট করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন জ্বলন্ত হোটেলের দিকে। বিড়বিড় করে বলতে বলতে চললেন :

"অভিমানিনী মেয়ে আমার, একটু ঘর চেয়েছিল, একটু শান্তি চেয়েছিল। বড় সাধ ছিল মেয়ের স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করবে। ঘর থেকে বেরিয়ে দশ জনের সামনে বেলেল্লাপনা করতে হবে না! দশ জনের মনের মত হয়ে চলতে হবে না। দশ জনের সামনে ন্যাকাপনা করতে হবে না।—এতদিনে ঘর পেয়েছে আমার মেয়ে, মেয়ের উপযুক্ত ঘর পেয়েছে। মেয়ে যে আমার ভাস্বতী, কাজেই জ্বলন্ত ঘর ছাড়া আমার মেয়ের ভাগ্যে অন্য ঘর জুটবে কি করে—"

বলতে বলতে হঠাৎ দৌড় লাগালেন ভাস্বতীর মা। দৌড়ে গিয়ে জ্বলন্ত হোটেলের জ্বলন্ত দরজাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

চিৎকার করে উঠলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ : "বকু—বকু—"

অসহায় ভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত দরজাটার দিকে। সেই ফাঁকে নীচু হয়ে কল্যাণকে কাঁধে তুলে নিলেন রুদ্রমশাই। পণ্ডিতজীর নজর পড়বার আগেই সেই গুরুভার কাঁধে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলেন তিনি হোটেলের দিকে। নজর পড়তেই আর এক বার চিৎকার করে উঠলেন পণ্ডিতজী :

"এ কি! কোথায় যাচ্ছ ওকে কাঁধে করে ?"

আরও কয়েক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্রমশাই। সেই মুহূর্তে মস্ত একখানা জ্বলন্ত কাঠ হোটেলের ওপর থেকে খসে পড়ল। পড়ল শান্তনু রুদ্র আর পণ্ডিত নীলকণ্ঠের

মাঝখানে। আগুনের হলকায় পেছনে ছিটকে পড়লেন পণ্ডিতজী। পড়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রাণপণে ডাক দিলেন :

"পালিয়ে এস শান্তনু, ওকে ফেলে দাও, পালিয়ে এস শিগ্‌গির, বাড়িটা ভেঙে পড়ছে।"

আগুনের আভায় ভয়ানক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তখন রুদ্রমশাইকে। তখনও তাঁর কাঁধে রয়েছে কল্যাণ। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন—

"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ, সর্বকর্মাণি
সাধয় স্বাহা।"

এক বার দু বার তিন বার, বার বার ঐ মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন রুদ্রমশাই!

মড় মড় মড়াৎ—বিকট শব্দ উঠল।

তার পর জ্বলন্ত হোটেলের সামনের অংশটা নেমে এল আলগা হয়ে। রুদ্রমশাইকে আর দেখা গেল না।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ প্রথমে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি আবার চোখ মেললেন। তাঁর সামনেই আগুন। আগুনের আঁচে সর্বাঙ্গ ঝলসে উঠছে তাঁর। তবু তিনি এক পা নড়লেন না। অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেই সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করল একটি সুর। সুরটা যেন সেই অগ্নিকুণ্ড থেকেই জন্মলাভ করল। ঠোঁট নড়তে লাগল পণ্ডিতজীর। আগুনের হুহুংকারের সঙ্গে মিশে স্পষ্ট হয়ে উঠল আর এক মন্ত্র—

ওঁ কালো লি করুতে ভবান্ সর্বলোকে শুভাশুভান্।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সর্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ॥

গৌরীশৃঙ্গ হোটেলের পেছনের একটা ছোট ঘর। ঘরখানায় বোধ হয় হাঁস মুরগি জিইয়ে রাখা হত উঁচু দরের রসনার তৃপ্তি-সাধনের জন্যে। সেই ঘরের কাঠের মেঝের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে কে!—ওকেও কি চপ-কাটলেট বানাবার জন্যে ফেলে রাখা হয়েছে নাকি! বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আগুনের আভা এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। তখন যেন মনে হচ্ছে, যে পড়ে আছে সে মানুষ। আগুনের আভাটা যখন থাকছে না, তখন মনে হচ্ছে মানুষ নয়—। মস্ত বড় একটা পাখীর ডানা কেটে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সেই ঘরের মধ্যে নীচু হয়ে কে ঢুকল। ঢুকল খুব ভারী একটা কিছু ঘাড়ে করে নিয়ে। ঢুকে কাঁধের ভার মেঝেয় ফেলে হাঁই-হাঁই করে হাঁপাতে লাগল।

আগে থেকে যে পড়ে ছিল সে নড়ে উঠল। ক্ষীণকণ্ঠে বললে:

"পেলে! পেয়েছ তাকে!"

যে হাঁপাচ্ছিল সে জবাব দিলে:

"হাঁ পেয়েছি। কিন্তু জ্ঞান নেই। ঝলসে গেছে আগুনে, নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ম'ল। হায় হতভাগী—"

শুনে করুণকণ্ঠে কেঁদে উঠল প্রশ্নকারিণী:

"ভাস্বতী রে, এই ভাবে সব শেষ করে দিলি।"

টলতে টলতে ঘরে ঢুকল আর এক জন, হাতে একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন আগ্নেয়াস্ত্র। অন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয় লোকটা। লম্বা কোট, বাবরি চুল সব আধপোড়া। বাঁ হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে চোখ থেকে বাঁ হাত নামিয়ে বহু কষ্টে কি যেন দেখবার চেষ্টা করল সে। কি যেন খুঁজতে লাগল ঘরের মধ্যে। বীভৎস চিৎকার করে উঠল তার পর:

"পেয়েছি, পেয়েছি এবার। কোথায় যাবি আমার হাত ছাড়িয়ে।"

বলতে বলতে ছু বার ফায়ার করলে। ছম ছম,—ছুটো আওয়াজ হল। আওয়াজের ধাক্কাতেই বোধ হয় হুঁশ ফিরে এল ভাস্বতীর। বহুকষ্টে উঠে বসল সে। তার পর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল আধপোড়া মানুষটার দিকে। সে তখন আবার নিজের চোখ চেপে ধরেছে বাঁ হাত দিয়ে। ডান হাতে তখনও সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা রয়েছে। বিড়বিড় করে বলছে ঃ

"ম'ল কি ? মরেছে কি শত্রু ! আর সাড়া পাচ্ছি না কেন !"

হিয়াকে জাপটে ধরে তাপস রুদ্র তখন নিঃশব্দে ঘষটে ঘষটে পিছিয়ে চলেছে ঘরের অপর কোণে। যদি কোনও রকমে খুনেটার নজর এড়াতে পারে।

ভাস্বতী প্রাণপণ চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছেছে তখন অর্ধোন্মাদ লোকটার পায়ের কাছে। হঠাৎ সে সজোরে তার পায়ে মারল এক ধাক্কা। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘরের অপর কোণে। রিভলভারটা তার হাত থেকে ফসকে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল হিয়া আর তাপস রুদ্রের হাতের কাছে !

চিৎকার করে উঠল ভাস্বতী ঃ

"তুলে নে হিয়া, তুলে নে ওটা। তুলে নিয়ে শেষ করে দে শত্রুকে।"

"কে ও ! ও কে ?"

চিৎকার করে উঠল তাপস রুদ্র।

"ও কে জান না তুমি ? ওর বিচার হয়ে গেছে, তুমিই ওকে সব কবুল করিয়েছ। তার পর ঐ শত্রু পালিয়ে এসেছে।"

অতি বিষাক্ত কণ্ঠে জবাব দিল ভাস্বতী।

"কে ! তোমার স্বামী ?"

আঁতকে উঠল হিয়া।

"হ্যাঁ, স্বামী।...স্বামীই বটে। স্বামী কি না, তাই ওকে বিশ্বাস রে সর্বস্ব ওর পায়ে সঁপে দিয়েছিলাম।" বলতে বলতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল ভাস্বতী। তার পর শুয়ে পড়ে রিভলভারটা ছুঁতে পারলে।...সেটা তুলে নিয়ে উঠে বসল।...আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল ঃ

"স্বামী আমার আবার জ্যোতিষ জানতেন। আখেরী পন্থ নাম দিয়ে খবরের কাগজে ফলাফল লিখতেন, নিজের ঠিকুজী আমার ঠিকুজী বিচার করে বলেছিলেন, আমার নাকি দেবারিগণ। আমি নাকি নিজের হাতে স্বামীকে খুন করব।...হি হি হি হি হি হি —স্বামীর কথা কি মিথ্যে হতে পারে—হি হি হি হি হি—"

হাসি সামলে দম নিয়ে আবার বলতে লাগল ঃ

"আহা, স্বামী দেবতা। দেবতা স্বামী দেবত্বের খাতিরে দেশের দশের সর্বনাশ করে আমার মন রাখছিলেন।...আজ, আজ সেই দেবত্বের শেষ করি নিজের হাতে।...আমার যে দেবারিগণ—"

"দুম্"—একটা আওয়াজ হল।

"আঁ—"

অন্তিম আর্তনাদ উঠল ঘরের মধ্যে।

"কি করলি ভাস্বতী! করলি কি!"

কেঁদে উঠল হিয়া।

আরও একটা আওয়াজ হল—দুম্।

বাইরে থেকে এক ঝলক আগুনের আভা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। ওরা দেখল, ভাস্বতীর মুখখানা ভয়ানক রাঙা হয়ে উঠেছে। তার পর ওরা হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছল ভাস্বতীর কাছে। উবুড় হয়ে পড়েছে সে তখন, রিভলভারটা কিন্তু ছাড়ে নি। তখনও সেটা চেপে ধরে আছে ডান দিকের রগের পাশে।

—শেষ—